প্রথম প্রকাশ
১ আগস্ট ১৯৫৫

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
প্রদীপকুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে

নিবেদন

প্রায় এক যুগ আগে স্বনামধন্য লেখক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে যখন প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর গবেষণা করার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হই তখন তিনি এরকম একটা গ্রন্থ পরিকল্পনায় আমাকে উৎসাহিত করেন। অতঃপর ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব' সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে শ্রীযুক্ত বসুর পরিকল্পিত এই গ্রন্থটির কাজও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। ইতিমধ্যে ঈসকাইলাস ও শেলির প্রমেথিউস বাউণ্ড ও প্রমেথিউস আনবাউণ্ড গ্রন্থ দুটির তর্জমা প্রকাশের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পূর্ব পরিকল্পিত গ্রন্থটির কাজ শ্লথ ও বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রয়োজনে একখানি বৈষ্ণবপদ সংকলনের সম্পাদনা করতে গিয়ে অবহেলিত পরিকল্পনাটিকে গ্রন্থরূপ দিতে পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠি। শেষ পর্যন্ত নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে আশা প্রকাশনীর উদ্যোগে পরিকল্পিত গ্রন্থটি এতদিনে প্রকাশিত হল। অধ্যাপক বসুর পরিকল্পনাটি সম্ভবতঃ কল্পনাতেই রয়ে গেল, বাস্তবে যা প্রকাশ পেল তা এর খণ্ড, ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ রূপ। কারণ সে পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গেলে যে ধৈর্য ও সহায় এবং সামর্থ ও আনুকূল্যের প্রয়োজন তা বর্তমান লেখকের নেই। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বারে বারে ক্ষুণ্ণ মনে পরিকল্পনাটিকে ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ রাখতে হয়েছে. 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না' এই ভেবে নিরস্ত হতে হয়েছে।

এই গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ আমার, দুই তৃতীয়াংশ আধুনিক মহাজনদের। সেই জীবিত এবং বিগত সকলের উদ্দেশ্যে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম। আর এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনান্তে যিনি এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই স্বনামধন্য সুলেখক ও গবেষক বৈষ্ণব রসসাহিত্যে আমার পূজনীয় দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

বিনীত

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বীকৃতি

বর্তমান গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকার বিভিন্ন লেখক, পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে ঋণী। সকলের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। প্রণাম জানাই সাহিত্য পরিষদ মন্দিরকে যেখানে বসে দীর্ঘকাল ধরে পত্রপত্রিকা ব্যবহার করে এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যেও নমস্কার।

এ গ্রন্থের ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের কাছেও আমি ঋণী। বন্ধুবর শ্রীসুধীর ভট্টাচার্যের সাগ্রহ উদ্যোগে এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হ'ল। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। গ্রন্থটির ভূমিকা অংশ পড়ে যথোপযুক্ত পরামর্শ দান করেছেন শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ। দুজনেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থের প্রদর্শনী অংশের নির্বাচন ও পাঠ নির্ধারণে সহযোগিতা করেছেন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ও ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত। এঁদের প্রতি আমার অশেষ ধন্যবাদ। পত্রিকাপঞ্জী নির্মাণের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছেন বন্ধুবর ডঃ শ্রীহরি মাইতি। পাণ্ডুলিপি তৈরি ও মূলের সঙ্গে পাঠ মেলানোর কাজে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিনী ও সহকর্মিনী অধ্যাপিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ডঃ অরুণ বসু, ডঃ নির্মল দাস এবং বন্ধুবর ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপিনাকেশ সরকার। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম 'বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে'। বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে মোটামুটি একশ বছরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস ও সঙ্কলন। গত শতক থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক ও সমালোচক সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে নানাপ্রকার আলোচনা করেছেন। কালপারম্পর্য অনুযায়ী এক একজন বৈষ্ণব পদকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের ভিন্নভিন্ন জনের রচিত আলোচনাগুলিকে যদি পর পর সাজিয়ে পর্যালোচনা করা যায় তাহ'লে আধুনিক যুগের সমালোচনায় ও সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের উত্থান-পতনের দিকটা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে ধর্মভাবনামুক্ত আধুনিক কাব্যরসিকের বিশুদ্ধ রসদৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিদের নবজন্মের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তটি ব্যক্ত হয়। মধ্যযুগের মহাজন-মহিমা ও গোস্বামী-গরিমা থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক নবমূল্যবোধের বিচারে বৈষ্ণব পদকারদের কবিব্যক্তিত্বের নব-আবিষ্কারকে কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

'গীতগোবিন্দ' শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটিতে। জয়দেব সম্পর্কে এটাই আধুনিককালের প্রথম বাংলা সমালোচনা। এই আলোচনাটিকে প্রথমে রেখে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বৈষ্ণব কবি সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আলোচনাগুলিকে কবিপরম্পরায় কালপারম্পর্য অনুযায়ী আলোচনা ও সংকলন করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সমীক্ষা ও সংগ্রহের সময়সীমা মোটামুটি ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রকাশিত গ্রন্থান্তর্গত রচনা ছাড়া গতশতকের ও বর্তমানকালের পত্রিকাভুক্ত বহু রচনার নিদর্শন ও আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। বঙ্গদর্শন, ভারতী সাধনা, আর্যদর্শন, আলোচনা, নবজীবন, প্রদীপ, নব্যভারত, বান্ধব, সাহিত্য,

নারায়ণ, বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিশ্বভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি অনুসন্ধান করে প্রবন্ধগুলি আলোচনার জন্ত নির্বাচন করা হয়েছে। ইংরাজি রচনাগুলি অনুবাদ করে সংকলনে নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থে পরিবর্তিত হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রবন্ধটির গ্রন্থ সংস্করণটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্ত হল শতাধিক বৎসর ধরে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে যে ধারাবাহিক গবেষণা ও সমালোচনা হয়েছে তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে এর সামগ্রিক মূল্য বিচার। গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের প্রথমে থাকবে মধ্যযুগের সূচক পদে বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গের আলোচনা; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে থাকবে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে গত শতকের ও বর্তমানকালের গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস; দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের সমালোচকদের আলোচনার নির্বাচিত নিদর্শন,—এই দুটি পর্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত।

সূচকপদে কবিপ্রসঙ্গ

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতিকবিতা, নাটক, জীবনী অনেক রচিত হয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা বা বৈষ্ণব কবিদের সমালোচনার পূর্ণাঙ্গ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাধামোহনের 'মহাভাবানুসারিণী' টীকা কালিদাস সম্পর্কে মল্লিনাথের টীকার মতই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ শব্দার্থব্যাখ্যা, আধুনিককালে সমালোচনা বলতে যা বোঝায় মধ্যযুগে বৈষ্ণব-পদাবলী ও বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে সে ধরণের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—

(১) সমালোচনার মধ্যে থাকে ব্যাখ্যা ও বিচার। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শাস্ত্রবিচার অনেক হলেও বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্য বিচার বিশেষ হয়নি। সাহিত্য বিচারে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন মধ্যযুগের বৈষ্ণব রসিকদের তা ছিল না। প্রাগাধুনিক যুগে বৈষ্ণবপদাবলীকে বৈষ্ণব সমাজ ধর্মসাধনার উপকরণ হিসেবে দেখেছে; তার ফলে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব পদাবলীর আলঙ্কারিক টীকা ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কাব্যকে বিশুদ্ধ কাব্যরূপে ব্যাখ্যা ও বিচার করা হয় নি। "When you sit down to read poetry leave aside all religious bias"—মধুসূদনের এই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগে ছিল না বলেই বৈষ্ণব কবিতার বিশুদ্ধ কাব্য সমালোচনা মধ্যযুগে সম্ভব হয় নি।

(২) মধ্যযুগের বৈষ্ণবমনীষীদের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ কাব্যরসিক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের রসদৃষ্টি ছিল মূলত: সংস্কৃতপন্থী। আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথের আদর্শানুযায়ী মধ্যযুগের বৈষ্ণব পণ্ডিত ও বৈষ্ণবরসিকগণ নায়কবিভাগ, নায়িকাবিভাগ, আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাব, অনুভাব সঞ্চারীভাবের অতিশয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও শৃঙ্গার রসব্যাখ্যার বৈচিত্র্য বিধানে যদিও প্রচুর আলঙ্কারিক তৎপরতা দেখিয়েছেন, কিন্তু রসবাদীদের মতো কাব্যকে কবির থেকে পৃথক করে নিরালম্ব রসবস্তুরূপে আস্বাদ করেছেন—এর ফলে একধরণের কাব্য জিজ্ঞাসা মিটলেও কবিকৌতূহল গৌণ হয়ে পড়েছে।

(৩) সমালোচনার ব্যাখ্যার অংশেও বৈষ্ণব পণ্ডিতরা ছিলেন সংস্কৃত টীকাকারদের মতোই ধ্রুপদীপন্থী। মেঘদূতের টীকার প্রারম্ভে মল্লিনাথ বলেছেন—

'ইহান্বয়মুখেনৈব সর্ব্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥'

অর্থাৎ "আমি এখানে সবই অন্বয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধ দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। এখানে মূলের সঙ্গে অসম্বন্ধ কিছু থাকিবে না এবং অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত কিছু বলিব না।" (বাংলা সমালোচনা পরিচয়, পৃঃ ১০—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীর ব্যাখ্যার মধ্যে অন্বয় ব্যাখ্যার ধ্রুপদী নিষ্ঠাই চোখে পড়ে, আধুনিককালের সৃষ্টিমূলক সমালোচনার রোমান্টিক আদর্শ মধ্যযুগে লক্ষ্য করা যায় না।

(৪) মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে যে সমস্ত সূচক বা প্রশস্তি কবিতা রচিত হয়েছে সেখানে কদাচিৎ মূল্যবান সমালোচনা মূলক মন্তব্য যদিও চোখে পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ভক্তিপূর্ণ বন্দনা। প্রশস্তিবাণী যেহেতু বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর কবিপ্রতিনিধির কাছ থেকে এসেছে সেই কারণে বৈষ্ণবধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখানে খুব স্পষ্ট। এর ফলে বন্দনীয় কবিরা অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্ত পরিচয়ে অর্চিত হয়েছেন; যে কারণে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাকচৈতন্যযুগের কবিগণ বৈষ্ণবনবরসিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

(৫) সর্বশেষে সমালোচনা যেহেতু বিচারমূলক আলোচনা সেই কারণে এর মাধ্যম হওয়া উচিত নৈয়ায়িক গদ্য; অবশ্য কবিতার সমালোচনা হলে তাতে কবিত্বের ছোঁয়া এসে পড়ে; আধুনিককালে গদ্যের আবির্ভাবের ফলেই সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভব। মধ্যযুগে গদ্যের প্রচলন ছিল না বলে কবিতাতে বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে,—আবেগ ও উচ্ছ্বাসে তা কবি প্রশস্তি হয়ে উঠেছে। তার ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচার হয়ে উঠেছে বন্দনা; রাধামোহনের টীকা ব্যাখ্যা অবশ্য সংস্কৃত গদ্যে রচিত, কিন্তু তা সংস্কৃতানুসরণের ফলে শব্দার্থের অন্বয় ব্যাখ্যা;—আধুনিককালে সমালোচনা বলতে যা বোঝায় তা সত্যই মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। এসত্ত্বেও মধ্যযুগের কবিপ্রশস্তিগুলিতে

প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক মন্তব্য উদ্ধার করা যায় তার থেকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সম্পর্কে মধ্যযুগীয় মূল্যায়ন অনুধাবন করা যেতে পারে।

জয়দেব সম্পর্কে—ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস ভক্তমাল গ্রন্থে জয়দেবকে বলেছেন রাজচক্রবর্তী; তুলনায় অন্যান্য কবিরা হলেন ক্ষুদ্র ভূস্বামী। গীতগোবিন্দকে বলেছেন খ্যাতিতে ত্রিভুবনভাস্বর কাব্য।

জয়দেব কবি নৃপচক্কৈব, খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আনি কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর॥

গোবিন্দদাস পদ্মাবতীরমণ জয়দেবকে বলেছেন 'কবিকুলভূষণ'। ছন্দ-সরস্বতী জয়দেবের আজ্ঞায় সর্বদা নৃত্য করেন—এই মন্তব্যে জয়দেবের ছন্দোপ্রভুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।

শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূষণ পদ্মাবতী হৃদয়বিলাসী।
যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত বাগরাণী জনু দাসী॥

এ ছাড়া জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীকে গোবিন্দদাস ভূতলে অতুল ও অমৃত সদৃশ বলেছেন। কিন্তু প্রশস্তি পদের এক জায়গায় বলেছেন—"লাঞ্ছিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী রাইক মান লাগি ফিরে"—জয়দেবের গীতগোবিন্দের মান পর্যায়ে কৃষ্ণের বিদেশিনীরূপে রাধানুসন্ধানের কোন নিদর্শন নেই; এখানে সম্ভবতঃ জয়দেবের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোবিন্দদাসের অনবধানে চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। অন্য একটি বন্দনা পদে গোবিন্দদাস জয়দেবকে 'কবীশ্বর সুরতরু' বলে সম্বোধন করে ভক্তহৃদয়ের প্রণাম জানিয়ে বলেছেন 'রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে কবিকুলগুরু দ্বিজদেব'। ভক্তিউচ্ছ্বসিত হলেও মন্তব্যটি যথার্থ; জয়দেব বস্তুতই পদাবলীকারদের 'কবিকুলগুরু'।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী জয়দেবের বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময় বিরচিত মনোহর ছন্দ।' গীতগোবিন্দের মনোহর ছন্দ সুধাই যে একাব্যের আসল মনোহারিত্ব এটা মধ্যযুগেও স্বীকৃত হয়েছে। কীর্তনানন্দের সঙ্কলক গৌরসুন্দর দাসও গীতগোবিন্দের 'অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ' অর্থাৎ style এর প্রশংসা করে বলেছেন—

শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ।
সাধু রসিক জন সো রস পিবি পিবি পায়ই বড়ই আনন্দ॥

জয়দেব স্বয়ং নিজের কাব্যের পরিচয়দান প্রসঙ্গে একদিকে নিজের রচনা রীতির শুদ্ধতার কথা যেমন বলেছেন—'সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব' অর্থাৎ কবি শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ; তেমনি অন্যদিকে কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের দ্বিমুখী আবেদনের কথাও বলেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

'বিলাসকলাকুতূহল' ও 'হরিস্মরণ'—দুদিকে তাকিয়েই যে গীতগোবিন্দের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচিত, জয়দেবের সমালোচকরা অনেকক্ষেত্রে এটা মনে রাখেন নি। তার ফলে একদিকে গীতগোবিন্দের প্রচুর তত্ত্বব্যাখ্যা যেমন হয়েছে, তেমনি অপরদিকে লৌকিক ও মানবিক ব্যাখ্যাও অনেক হয়েছে। এরফলে দু ধরণের সমালোচনাই কিছু পরিমাণ আংশিক। জয়দেব সম্পর্কে দু যুগের দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলেই, এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

গোবিন্দদাসের জয়দেব বন্দনা—

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদপল্লব ছাহে।
তাপতাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল
জুড়াইতে করু অবগাহে॥
জয় জয় পদ্মাবতী-রতিসেব।
রাধারমণ চরিত রস বর্ণনে
কবি কুলগুরু দ্বিজ দেব॥
যছপি সুনীচ কদাচার বাসিত চিতে
অছু কর যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত সুহীন অধিকৃত
মহত করু বলে হোই॥
তৃণ ধরি দশনে চরণ পর নিবেদিয়ে
মঝু মানস করু পূর॥
গোবিন্দদাস কোই অধমাধম
রাই কানু জনু দূর॥

মাইকেল মধুসূদনের 'জয়দেব' নামক সনেট

চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে
তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা সৌদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজি বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকুলকুল এ তোমার ছলে
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,
বহিবে সমীর ধীর সুস্বর লহরী,
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে। আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে
মনে॥

গোবিন্দদাসের কবিতায় জয়দেব পাঠের ফলশ্রুতি হরিস্মরণ। আর মধুসূদনের সনেটটিতে জয়দেব বিলাসকলা কুতূহলের কবি। জয়দেব সম্পর্কে গোবিন্দদাসের দৃষ্টি বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টি, আর মধুসূদনের দৃষ্টি আধুনিক রোমান্টিক কবির। গোবিন্দদাস জয়দেব-পদ্মাবতীর মধ্যযুগীয় গোস্বামী সাধনার কিংবদন্তীকে সম্মান করেছেন। মধুসূদনের কাছে জয়দেব বৈষ্ণব সাধক রূপে বিচার্য নন, এখানে তাঁর পরিচয় বিশুদ্ধ কবিরূপে, তাই জয়দেবের পাশে পদ্মাবতীর কিংবদন্তী এখানে যথেষ্ট জরুরী নয়। গোবিন্দদাস নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচেন' মনে করে তৃণদন্তে অবনত হয়ে জয়দেবের পদপল্লবে উপনীত। জয়দেব রূপ সুরতরুর কাছে তাঁর বিনীত প্রার্থনা এই যে, গীতগোবিন্দের ভক্তিমাহাত্ম্যে তাঁর মনের সমস্ত কদাচার বিদূরিত হয়ে যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি স্ফুরিত হয়। আর মধুসূদন স্পষ্টই বলেছেন—'না পাই যাদবে যদি' অর্থাৎ জয়দেবের কাব্য পড়ে যদি হরিস্মরণ নাও হয় তাতে ক্ষতি নেই, কারণ জয়দেবের কাব্য তাঁকে যদি বৃন্দাবনের নিত্য-সৌন্দর্যলোকের অমরাপুরীতে নিয়ে যায় যেখানে সুরে সুরে শিখী নৃত্য, কোকিল কূজন, সমীর লহরী, যমুনাউজান তাহলেই কবি কৃতার্থ। কবির কাছে রাধাকৃষ্ণ-স্মরণের জন্যে নয়, প্রেমবিলাসের উপযোগী নিসর্গ স্মরণের জন্যই জয়দেবপাঠ।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে—বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগে 'অভিনব জয়দেব' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এই উপাধি ভূষণের মধ্যে জয়দেব বিদ্যাপতির তুলনাগত সাদৃশ্যের আভাস আছে। আধুনিককালে বঙ্কিমের আগে এই দুই কবির পার্থক্য ও বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি সম্পর্কে গেবিন্দদাসের যে কবিপ্রশস্তি, তাই মধ্যযুগে বিদ্যাপতি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা—

কবি বিদ্যাপতি মতি মানে
লাখ গীতে জগ চীত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি বাণি।
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধিল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥

এ যেন মধুসূদনের প্রতিশ্রুতি—

কবিচিত্ত ফুলবনমধু

লয়ে রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ভারতবিখ্যাত ও ভুবনখ্যাত ভারতীবাণীর সারবস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন মধ্যযুগের আলঙ্কারিক কবিসার্বভৌম বিদ্যাপতি ও আধুনিক যুগের মহাকবি মধুসূদন। দুজনের প্রতিভাই বস্তুমুখী; পাণ্ডিত্যও সর্বস্বীকৃত। মূলতঃ গীতিকবি হলেও দুজনের কবিপ্রবণতা বিষয়মুখী, বর্ণনাপ্রধান, রূপমুগ্ধ, ঐশ্বর্য-লোলুপ, ভোগাসক্ত। দুজনের সম্পর্কেই এমার্সনের বিখ্যাত উক্তি প্রযোজ্য—'The greatest genious is the most indebted man'. কালিদাস, অমরু, জয়দেব, প্রভৃতি কবির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সকলোপজীবী বিদ্যাপতি শেষপর্যন্ত ভুবনোপজীব্য হয়ে উঠেছেন।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে—মধ্যযুগে চণ্ডীদাস সম্পর্কে বহু কবিপ্রশস্তি রচিত হয়েছে। জয়ানন্দ, নরহরি সরকার, প্রসাদ দাস, গোবিন্দদাস, কানুরাম দাস, নরহরি চক্রবর্তী, বৈষ্ণব দাস প্রমুখ বহু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বন্দনার পদ রচনা করেছেন। অধিকাংশ বন্দনা পদে ভক্তপ্রাণের উচ্ছ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ আবেগ যতটা লক্ষ্য করা যায় সমালোচনামূলক মনোভাব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তৃপ্ত হতেন এই মর্যাদাতেই চণ্ডীদাস মহাজনগৌরব লাভ করেছেন,—বৈষ্ণব ভক্তকবিরাও বিচারের পরিবর্তে শ্রদ্ধার্ঘ্যের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চণ্ডীদাস বন্দনা করেছেন। কিন্তু এই ভক্তিপূর্ণ বন্দনার মধ্যেও কোথাও কোথাও সমালোচকের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। প্রসাদ দাস চণ্ডীদাসের পদমাধুর্যের প্রশংসা করে বলেছেন—

'মধুর মধুর শবদে গাইলা যুগল রসের ভাষ।'

কানুরাম দাস চণ্ডীদাসকে ভাবুক, রসিক, প্রেমিক ও সাধক বলে সম্বোধন করে প্রসাদগুণসম্পন্ন চণ্ডীদাসের কবিতার ভাষার লালিত্য ও অতুলনীয় কবিত্বের প্রশংসা করেছেন—

কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জল কবিত্ব ভাষার লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।

'হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে'—এই মন্তব্যের মধ্যে চণ্ডীদাসের প্রেরণামুখ্য কবিপ্রতিভার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সহজ ও স্বভাবকবিত্বের স্বতস্ফূর্ততার ফলে চণ্ডীদাসের রচনায় কোন কষ্টকল্পনা ও সচেতন প্রয়াস নেই, ভাব ও ভাষা কোনটাই প্রধান নয়, পরস্পরের অধীন। **Inspired poetry** সম্পর্কে আলঙ্কারিকরা যা বলেছেন, চণ্ডীদাস সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিতে তাই বলা হয়েছে। বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের 'মধুর রস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীতের' কথা বলেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার কোন নিদর্শন মেলে না। গদ্যপদ্য মিশ্রিত উল্লিখিত রচনা সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহজিয়াদের দেহকড়চা বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীদাস সম্পর্কে আর যে সব মন্তব্য পাওয়া যায় তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনসংক্রান্ত কাল্পনিক বর্ণনা ও রামী-চণ্ডীদাস সংক্রান্ত বিচিত্র কিংবদন্তী। এগুলি চণ্ডীদাসের কাব্যপরিচয় ও কবিপরিচয় নির্ণয়ে বিশেষ কোন সহায়তা করে না, বরং বিভ্রান্ত করে।

গোবিন্দদাস সম্পর্কে—গোবিন্দদাস কবিরাজই এর পর মধ্যযুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান বৈষ্ণব কবি। বহু বৈষ্ণব কবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় এই কবির প্রশংসা করেছেন। রাধামোহন ঠাকুর কবীন্দ্র গোবিন্দের কবিত্ব সিদ্ধিতে ধরণীধন্যতার কথা বলেছেন—

শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥

নরহরি চক্রবর্তী গোবিন্দদাসের কাব্যরচনা কৌশলের প্রশংসা করে বলেছেন—

পরম বিচিত্র কাব্য বিন্যাস কি রচব স্তুকৌশল নহু অবগাহ।
তিখিন বাণসম বেধই হিয় শির ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ॥

গোবিন্দদাস জয়দেব সম্পর্কে যা বলেছিলেন (যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত বাগরাণী জনু দাসী) সেই কথাই বল্লভদাস গোবিন্দদাস সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন —'বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে অলৌকিক কবি শিরোমণি'। গোবিন্দদাস জয়দেবের মতোই যে বাণীপ্রভু তা এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—বল্লভদাসের এই উক্তিতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের তুলনামূলক সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দের কবিত্বশক্তি যে ন্যূন নয়, এটাও বল্লভদাস উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ সমালোচক অবশ্য গোবিন্দদাস নিজেই। গোবিন্দদাসের কাব্যের প্রধানগুণ

উচ্চারণ-সুখদ ও শ্রবণসুভগ সঙ্গীতধর্মিতা। গোবিন্দদাস এর উল্লেখ করে বলেছেন—রসনারোচন শ্রবণবিলাস / রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস।

অন্যান্য কবি সম্পর্কে—গৌরপদতরঙ্গিণীতে (২য়: সং, ৩০২ পৃ:) উল্লিখিত শেখরের ভণিতাযুক্ত একটি পদে নরহরি সরকার সম্পর্কিত প্রশস্তি উপলক্ষে বলা হয়েছে যে গৌরাঙ্গের জন্মের আগের থেকেই তিনি পদ রচনা করতেন।—

'গৌরাঙ্গ-জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।'

এতটা সত্য না হলেও গৌরাঙ্গের বয়োজ্যেষ্ঠ নরহরি গৌরসংস্পর্শের আগের থেকেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করতেন বলে মনে হয়। গৌরপদতরঙ্গিণীর অন্তর্ভুক্ত বাসুদেব ঘোষের একটি পদে আছে যে, নরহরি সরকারের পদই তাঁর পদরচনার প্রেরণা—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥

গৌরপদ রচনায় নরহরি সরকার যে প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করেছেন তা তাঁর একটি পদে আছে—

গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

বৃন্দাবন দাসের প্রশস্তি সূচক একটি পদ আছে উদ্ধবদাসের নামে গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে (৩০৫ পৃ:)। পদটিতে কবি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের প্রশস্তি করেছেন, চৈতন্যভাগবতের নয়।

ধন্য ধন্য বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যমঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ॥
সার রসময় পদাবলী।
শুনিলে পাষাণ যায় গলি॥

জ্ঞানদাসের কবিপরিচয় প্রসঙ্গে গৌরপদতরঙ্গিণীতে (৩:৩ পৃ:) উদ্ধৃত একটি পদে ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের তুলনা করে লিখেছেন—

কবি কুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, সূচকপদের অন্যতম রচয়িতা সুকবি রাধাবল্লভও জ্ঞানদাসের সম্পর্কে যেপ্রশংসনীয় মন্তব্য করেছিলেন তা গৌরপদতরঙ্গিণীর ৩১৩পৃঃ উদ্ধৃত হয়েছে— ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস।

এ গৌড়মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ॥
সুধামাখা যার পদাবলী।
শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি।
কবিত্ব সরসী মাঝে যার।
রসিক মরাল সদা দেয় ত সাঁতার॥

এ ছাড়া পদকল্পতরুর সঙ্কলনকর্তা বৈষ্ণবদাস তাঁর পদকল্পতরু সঙ্কলন গ্রন্থের নবম পদে অন্যান্য চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণবপদকর্তাদের সঙ্গে জ্ঞানদাসেরও বন্দনা করেছেন। অন্যতম বৈষ্ণব আচার্য রূপে নরোত্তমের প্রশংসা আছে গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত অনেকগুলি সূচক পদে; তার মধ্যে বল্লভদাসের রচিত নরোত্তমের কবিত্বপ্রশস্তির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য—

রচিলা অসংখ্য পদ   হৈয়া ভাবে গদ গদ
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে   আর যেবা গান করে
সেই জানে পদের গৌরব॥   (গৌ. ত.-৩২০ পৃঃ)

পদকল্পতরুর ১৮ সংখ্যক পদে বৈষ্ণবদাস শ্রীনিবাস-নরোত্তম থেকে আরম্ভ করে গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদাস বংশীয় ঘনশ্যাম বলরাম পর্যন্ত একটি বিস্তৃত কবি-তালিকা নির্মাণ করে একসঙ্গে সকলের প্রশস্তি করেছেন। তালিকার মধ্যে আছেন গতিগোবিন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কুমুদানন্দ, বীর হাম্বীর, কবিকর্ণপুর, নরসিংহ, বল্লবীকান্ত, শ্রীবল্লভ, যদুনন্দন দাস, ঘনশ্যাম, বলরাম দাস প্রমুখ আরও অনেক চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি। সূচক পদটিতে সমবেত কবিনাম ছাড়া আর খুব বেশী কিছু মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দদাস সম্পর্কে আছে বৈষ্ণবদাসের বিশেষ উচ্ছ্বাস—

জয় কবিরাজ   রাজ রস সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কতিহুঁ   না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেমমুরতি পরকাশ॥

যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত।
শুনইতে গর্ব খর্ব সব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত॥

গোবিন্দদাস-বংশীয় ঘনশ্যাম ও বলরামের যুগ্মপ্রশস্তিটুকুও পদটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

কবি নৃপ বংশজ ভুবনবিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জনে নিরুপম গুণগণ
গৌর প্রেমময় ধাম॥

সুতরাং দেখা গেল মধ্যযুগের সূচক পদে যে কবিপ্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাতে অল্পকিছু পদে সামান্য কিছু কিছু মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনা উপলক্ষে হয় উচ্ছ্বসিত ভক্তিপ্রকাশ অথবা তাৎপর্যহীন তালিকাবিস্তার। রঘুনাথদাস ও গোবিন্দদাসের সূচকপদে কবি সমালোচনার যে সম্ভাবনাময় সূচনা ও সূত্রপাত, সপ্তদশ শতকের বল্লভদাসের সূচকপদে তা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণবদাসের সূচকপদ বন্দনামুখ্য ও তালিকাসর্বস্ব। অবশ্য এই তালিকারীতি দেখা দিয়েছিল এর আগের থেকেই রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভ শ্লোকে যেখানে তিনি সপ্তকবির বন্দনা করে একটি শ্লোকে লিখেছেন—

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ॥
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধি তুল্যকান্।
যেষাং সংস্কৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

আধুনিক যুগে বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব কবিতা

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?'—উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কাব্যের 'বৈষ্ণবকবিতা'য় যে প্রশ্ন তুলেছেন, তার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এই যে, এ প্রশ্ন কেবল কোন এক কাব্যসৌন্দর্যরসিক কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে এ জিজ্ঞাসা একালের যুগজিজ্ঞাসা। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক যুগজীবনের অন্যান্য জিজ্ঞাসাগুলো খুব প্রবল হয়ে উঠলেও সাহিত্যজিজ্ঞাসা তখনও প্রকট হয়ে ওঠে নি—বিশেষত: বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে তো নয়ই। বরং এ যুগের বৈষ্ণবালোচনা মূলত: বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা এবং তাও অনেকক্ষেত্রে বিরূপাত্মক বিতর্কমূলক ও অস্বীকৃতিসূচক। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্য সমালোচনার কোন আদর্শ যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন সে যুগের প্রধান প্রধান গদ্যলেখকদের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনা দেখা দিয়েছে রামমোহনের বিরূপাত্মক বিতর্ক সমালোচনার ক্ষেত্রে, বিদ্যাসাগরের বাসুদেব চরিত নামক ছাত্রপাঠ্য অনুবাদ রচনায় এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয় কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা প্রবন্ধে। রামমোহন রায়ের কুলধর্ম বৈষ্ণব হলেও বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণলীলা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। এ কেবল নিরাকারবাদীর সাকার উপাসনার প্রতি বিরক্তি নয়, অর্চনীয় ঈশ্বরকে রাধাকৃষ্ণের সঙ্ সাজিয়ে চোখের সামনে নাচিয়ে উপভোগ করাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে অস্পৃশ্য। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যকে বিযুক্ত করে দেখবার সাহিত্যদৃষ্টি তাঁর এবং তাঁর যুগের ছিল না। তার ফলে তিনি 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'পথ্য প্রদান' ইত্যাদি বিতর্ক গ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন, কিন্তু ধর্মসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি নিয়ে বৈষ্ণব

কবিতাকে কবিতা হিসাবে বিচারের অবকাশ পেলেন না। বস্তুত উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে বৈষ্ণবপদাবলীকে বৈষ্ণবধর্ম থেকে পৃথক করে দেখার বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি দেখা দেয় নি বলেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৈষ্ণব পদ সাহিত্য বিশুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। ধর্মপ্রচার শিক্ষাবিস্তার ও তর্কবিতর্কের আসরে সাহিত্য বিচার ও শিল্পসৌন্দর্য চর্চার অবকাশ তখনও দেখা দেয় নি, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে তা সম্ভব ছিল না।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য সমালোচনার শুরু থেকেই বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য তার শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে সমাদরযোগ্য হয়ে উঠল। এর কয়েকটি কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ—এ যুগের আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হল নূতন দৃষ্টিতে পুরাতন কাব্যের মূল্যবিচার। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে মুদ্রিত এবং ইংরাজীতে ও বাংলায় অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর তালিকায় গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর নাম থাকলেও সংস্কৃত সাহিত্যের মতোই বৈষ্ণব পদাবলীর নবমূল্যবিচারের ক্ষেত্রটি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ নয়, দ্বিতীয়ার্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবকে (১৮৫৩) যদি আধুনিক যুগের প্রথম প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শন বলে ধরা হয়, তবে তার প্রকাশকালের গণ্ডী দ্বিতীয়ার্ধেরই সীমানায়। এখানেই মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্যের পংক্তিতে বাংলাদেশের আদি বৈষ্ণবকাব্যগ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দ নূতন দৃষ্টিতে আলোচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলীই নানাভাবে সংস্কৃত কাব্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী। এই কারণে উইলিয়ম জোন্স ম্যাকসমূলর প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারকে যখন গুণীজনসম্মুখে তুলে ধরলেন তখন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে প্রসারিত হল, তেমনি পদাবলীর প্রতিও তাঁরা অনুরূপ আকর্ষণ অনুভব করলেন। বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংস্কৃতকাব্য ও নাটক সম্পর্কিত সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণবগীতিকবিদের আলোচনাও প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের

প্রাচীন কাব্যের আলোচনাগুলি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা নয়, বৈষ্ণব কবিদেরও আলোচনা।

দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক যুগের সাহিত্যসমালোচনায় নবমূল্য বিচারের পথ ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যও একটি বিশেষ কারণে নতুন কৌলীন্যে আত্মপ্রকাশ করল। নবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের পাশে বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মাশ্রিত হলেও মানবিক প্রেমকে অবলম্বন করে এর কাব্যরূপ গড়ে উঠেছে বলে এর আবেদন দেশ ও কালকে অতিক্রম করে মানবজীবনের আদিম চিরন্তনতাকে আশ্রয় করে নিত্যকালের মহিমায় অধিষ্ঠিত। মধ্যযুগে ছিল দেববাদ নির্ভর মানবতাবোধ। আধুনিক যুগ দেবভক্তিবাদকে অস্বীকার করে যখন বিশুদ্ধ মানবতাবাদকে আশ্রয় করল তখনও যে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা এতটুকু মহিমাচ্যুত হল না, তার কারণ বৈষ্ণবধর্মকে বাদ দিয়েও আধুনিক যুগ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যুগোপযোগী জীবনপিপাসার অমৃত খুঁজে পেল। জীবনের যে প্যাশান এ যুগের ইংরাজি কাব্যপড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান অন্বিষ্ট, বৈষ্ণবপদাবলী তার সন্ধান দিতে পেরেছিল। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলী যে আধুনিক শিক্ষিতদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল তার কারণ বৈষ্ণব পদাবলী চিরকালের রোমান্টিক গীতিকবিতা। এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রধানতঃ ইংরাজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের গীতিকবিতার আবেগোত্তাপেই লালিত। শেলি বায়রণ প্রমুখ রোমান্টিক কবি তখন এদেশে বহু পঠিত। ডঃ স্মিথ রচিত ডাফের জীবনী থেকে জানা যায়, ১৮৩০ সাল থেকে বাংলাদেশে স্কট, বায়রণ ও বার্নসের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৭৪ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকা জানাচ্ছে "আজিকালি বায়রণের কাব্যের সম্যক সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সর্বত্রই বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই।" ১৮৭৮ সালের বান্ধব পত্রিকায় আছে "এদেশীয় কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই মিলটন, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের মন্ত্রশিষ্য।" বৈদেশিক রোমান্টিক গীতিপ্রবণতার জন্য একসময় বঙ্কিমকে বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্রকে বায়রণ, রবীন্দ্রনাথকে শেলি বলা হত। এই ব্যাপক রোমান্টিকতার আবহাওয়ায় বৈষ্ণব কবিতা স্বাভাবিক আকর্ষণেই এ যুগের কবি ও কাব্যরসিক সমালোচকের কাছে বিপুল সমাদর লাভ করেছে। বৈষ্ণব কবিতা যে আধুনিক যুগে এদেশে ও

বিদেশের কাব্যরসিককে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছে তার কারণ এর যুগল প্রেমের রোমান্টিক অনুভূতি। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগুলির মধ্যে কালিদাসের মেঘদূত যেমন রোমান্টিকতার জন্যই আধুনিক কালে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে বৈষ্ণবপদাবলীও ঐ একই কারণে এতবেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে অন্যান্য শক্তিশালী সাহিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মত মধ্যযুগের একটি প্রধান শক্তিশালী সাহিত্যশাখা যে আধুনিক যুগে ততখানি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না তার কারণ এ নয় যে মঙ্গলকাব্যে মানবিকগুণের অভাব ছিল, আসলে এ কাব্য বস্তুধর্মী বর্ণনাকে ছাড়িয়ে কোনদিন গীতিকবিতার রোমান্টিক ব্যঞ্জনায় পৌঁছালো না বলেই একালে তার আবেদন খুবই সীমাবদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের শাক্তপদাবলীর মতো শক্তিমান গীতিকবিতাও যে আধুনিক কালে বৈষ্ণব কবিতার পাশে দাঁড়াতে পারল না, তার কারণ এ নিতান্ত গার্হস্থ্য কবিতা, বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্যের মতো মানব জীবনের ধাতুগত বৃত্তিকে অবলম্বন করলেও বাংলাদেশের গৃহজীবনের গার্হস্থ্যরসকে অতিক্রম করে রোমান্টিক অনুভূতির উদার আকাশে মুক্তিলাভ করলো না বলেই আধুনিক রোমান্টিক গীতিভাবনার রাজ্যে ওর বাণী এসে পৌঁছালো না। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী প্রথমতঃ গীতিকবিতা এবং প্রধানতঃ রোমান্টিক গীতিকবিতা বলেই আধুনিক কালে এর শিল্পগত আবেদন এত বেশী। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর স্থান এই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ—বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব কবিসমাজ যে এযুগের প্রধান গবেষণার বিষয় তার কারণ বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইতিহাস সন্ধানী আধুনিক যুগমানসের ঐতিহ্যাভিমানবোধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব যেখানে পাঠ করেন, সেইখানেই এই স্বাদেশিক সাহিত্য দীক্ষার সূচনা। ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ সালে ময়েট সাহেব ও এদেশীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বীটন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ৮ই এপ্রিল ১৮৫২ খ্রীঃ হরচন্দ্র দত্ত বেঙ্গলী পোয়েট্রি নামে এক প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। প্রবন্ধকার ও আলোচনাকার কৈলাসচন্দ্র বসু এখানে বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা সম্পর্কে মন্তব্য করায় এরই প্রতিবাদে ১৩ই মে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েন। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় এ সম্পর্কে রঙ্গলাল বলেন—

"১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোনো কোনো সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস করিয়া এইরূপও বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি।"

বাংলাসাহিত্যকে সম্মানিত প্রতিষ্ঠাদানের জন্য যে অতীত ঐতিহ্যানুসন্ধান ও ইতিহাসমনস্কতা দেখা দেয় তার ফলেই আধুনিক কালে বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা ও গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ রচিত রঙ্গলালের বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ. ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত, ১৮৭১ খ্রীঃ রচিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস, ১৮৭৩ খ্রীঃ রচিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭৮ খ্রীঃ রাজনারায়ণ বসুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৮০ খ্রীঃ রমেশচন্দ্র দত্তের The Literature of Bengal, এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গতশতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। এ ছাড়া বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, নবজীবন, আর্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর এবং জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, নব্যভারত, প্রদীপ, বান্ধব, সাহিত্য ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা ও গবেষণার পীঠস্থল। বর্তমান শতকে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা বৈষ্ণব সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে মুখ্যস্থান গ্রহণ করলেও নারায়ণ, প্রাচী, প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। এছাড়া বৈষ্ণব পত্রিকা যথা গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, গৌরাঙ্গ পত্রিকা, বৈষ্ণব পত্রিকা, সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকা প্রভৃতির অবদান এক্ষেত্রে অবশ্য স্বীকার্য। বিদেশী লেখকদের মধ্যে জয়দেব প্রসঙ্গে জোন্স্, আর্নল্ড, ফ্রেজার, বিদ্যাপতি সম্পর্কে গ্রীয়ার্সন, এবং বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে জন্ বীমস্ এর নাম গতশতকের সমালোচক ও গবেষক হিসাবে স্মরণীয়।

গবেষণার ধারা

আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার প্রেরণারূপে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণীয়-'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' বস্তুত কবিত্ব বোঝার আগে কবি ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টাই আধুনিক যুগের গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা। এর ফলে অনেক খ্যাত-অখ্যাত বৈষ্ণব কবি যেমন তাঁদের ব্যক্তি পরিচয় নিয়ে এযুগে উদ্ঘাটিত হয়েছেন তেমনি তথাকথিত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যযুগের সহজিয়া সাধনার অলীক কিংবদন্তী থেকে টেনে এনে গোসাইএর পোষাক ছাড়িয়ে সত্যকার কবি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক কবিব্যক্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। চণ্ডীদাস কিংবদন্তীর একক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে বহুব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ মিথ্যা মৈথিল পরিচয়ের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

গত শতকে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার আসরে খ্যাত অখ্যাত অনেক বৈষ্ণব কবির আলোচনা হলেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি পরিচয় উদ্ঘাটনই এ যুগের গবেষণার মুখ্য ফলশ্রুতি। বিদ্যাপতি সমস্যার সমাধান গতশতকেই হয়ে গেছে, কিন্তু চণ্ডীদাস সমস্যা বর্তমান শতকে ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে আপাত সমাধানের মধ্যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

(ক) বিদ্যাপতি সমস্যা

১২৮২ সালে বা ১৮৭৫ খ্রী: বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এদেশে বিদ্যাপতির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল ১৮৭৩ খ্রী: Indian Antiquary পত্রিকায় John Beams এর বিবৃতি থেকেই তা লক্ষণীয়—

Native tradition represents him as the son of Bhabananda Roy a Brahmana of Baranator in Jessore. His real name was Basanta Róy.. The date of his birth is said to be A D. 1433 and of his death 1481. He mentions as the patrons Raj Sib Sinha Rupnarayana and Lachima Devi, wife of Sib Sinha and in one passage he prays for the five Lords of Gour.

১৮৫৮ খ্রী: বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় বঙ্গভাষার উৎপত্তি শীর্ষক প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৬৯ খ্রী: কবিচরিত রচয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ১৮৭৩ খ্রী: বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচনাকালে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ সকলেই বিদ্যাপতিকে পূর্বোক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবরূপে পরিচিত করেছেন, চৈতন্যজন্মের একশতাব্দী পূর্বে বিদ্যাপতির সময়কাল নির্দেশ করেছেন এবং বিদ্যাপতির পদের অপরিচিত মৈথিলশব্দগুলিকে দুর্বল বাংলা ভাষার উপর হিন্দী ভাষার প্রভাব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

১৮৭৫ খ্রী: বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির যথার্থ কবি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাজকৃষ্ণের এই যুগান্তকারী গবেষণা সম্পর্কে John Beams Indian Antiquary পত্রিকায় **'On the age and country of Bidyapati'** প্রবন্ধে বলেছেন—

'It has been usual to speak of this poet as the earliest writer of Bengal, and, as his language is decidedly Hindi in type, the opinion has been held by myself and others that the Bengali

language had at that time not fully developed itself out of Hindi.

This view is very distasteful to Bengalies, who are proud of their language and wish vindicate for it an original from some local form of Prakrit. They have apparently set to search out the age and country of Bidyapaties, so as to show whether he was really a Bengali or not. A very able article has appeared on this subject in last number of that excellant Bengali magazine, the Banga Darsana.'

'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করলেন, বিদ্যাপতি বাংলাদেশের নয়, মিথিলার। মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির শিবসিংহ রাজনামাঙ্কিত মৈথিল পদ, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির উল্লেখ, রাজবংশমালায় বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ ও লছিমাদেবীর নামোল্লেখ, মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতি সম্পর্কিত উপাখ্যান, মিথিলার দানপত্রে উল্লিখিত বিদ্যাপতিকে বিষফী গ্রামদান, মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত ভাগবতের অনুলিপি, ও বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা এবং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থ, মিথিলায় বর্তমান রাজা শিবসিংহের উত্তর পুরুষবর্গ, এবং বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির গীতের সঙ্গে মৈথিলী গানের সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রমাণগুলি বিদ্যাপতিকে অবিসংবাদিত ভাবে মিথিলার কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করল।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই ঐতিহাসিক গবেষণা সে যুগে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ অনেকেই প্রথমদিকে এই সত্য স্বীকার করেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের মত সমর্থন করে লিখেছেন—"আমরা পূর্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে বিদ্যাপতি বীরভূম বা বাকুড়ায় কোন প্রদেশে উৎপন্ন এবং ঐ প্রদেশেরই কোন রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠমাসের একটি প্রস্তাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে বিদ্যাপতি বিষয়ক কয়েকটি নূতন কথা লিখিত হইয়াছে। আমরা পূর্বে বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশবাসী ও তাঁহার রচনাকে বাজালার

আন্তকালের রচনা বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যাপতি যদি সত্যই মৈথিলি হয়েন তাহা হইলে আমাদের সে বিবেচনাকে ভ্রমমূলক বলিতে হয়, এবং বিদ্যাপতি বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কবি বলিয়া আমরা বহুকাল হইতে যে গর্ব করিয়া আসিতেছিলাম, সে গর্ব ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ এই যে, বিদ্যাপতির অনেক গীত এরূপ অবিমিশ্র সরল বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে তদ্দর্শনে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। আমাদের অনুমান হয় বাঙ্গালাদেশেই বিদ্যাপতির জন্মভূমি। তিনি এ দেশেই বিদ্যোপার্জনাদি সমাধান করিয়া যৌবনাবস্থায় মিথিলায় গমন পূর্বক তত্রত্য রাজার সভাসদ নিযুক্ত হয়েন, এবং সেইখানে থাকিয়াই আপনার কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত করেন।" রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ রচনার পরেও সোমপ্রকাশ পত্রিকা বলেছে—"জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভুশুটুর নামক গ্রামে ১৩২৫ শকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয়, এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক হয়।"

রাজকৃষ্ণের মতো 'সত্যানুসন্ধানের সততা' এ যুগের অনেকেরই ছিল না, তার ফলে স্বাভাবিক সংস্কার ও জাত্যভিমানবশতঃ রাজকৃষ্ণের এই গবেষণার সত্যতা সেদিন অনেক বাঙ্গালী গবেষক মেনে নেন নি, কিন্তু বিদেশী-লেখকদের এই সমস্যা না থাকায় John Beams, Indian Antiquary পত্রিকায় 'on the age and country of Bidyapati' প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণের গবেষণাকে সমর্থন করে ১৮৭৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লিখেছেন—

"We must then regard Bidyapati as a poet of Mithila, where he is still remembered and has left descendants. His language though no longer to be regarded as old Bengali is very closely akin to it and represents a link between fifteenth century Bengali and Hindi. With one hand he touches Surdas, with the other Chandidas.

গ্রীয়ার্সন মিথিলা বা উত্তর বিহারে রাজকার্য উপলক্ষে বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ ও পদ সংগ্রহ করে 'An Introduction of the Maithili language of North Bihar' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার ভূমিকায় বিদ্যাপতি

ও বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের বংশলতিকা নির্দেশ করে রাজকৃষ্ণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লিখেছেন—

"He was born at Bishaphi in the Madhubani subdivision of the Darbhanga District." রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৮ খ্রীঃ রচিত 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থে, রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮০ খ্রীঃ রচিত 'The Literature of Bengal' গ্রন্থে, এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন রাজকৃষ্ণের গবেষণার সত্যতাকে স্বীকার ক'রে আরও নতুন তথ্য সংযোগ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃতীয় সংস্করণ থেকে নিজের রক্ষণশীল মত পরিত্যাগ করে রাজকৃষ্ণের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে লিখেছেন—

"বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন।" গত শতকে বিদ্যাপতি সম্পর্কে এই প্রচুর গবেষণা বর্তমান শতকে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীর্তিলতা গ্রন্থ আবিষ্কারের পর। ১৩১৬ সালে সঙ্কলিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর সটীক সংস্করণের ভূমিকায় মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গবেষণা থাকলেও, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩১ সালে কীর্তিলতা গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে যে প্রামাণ্য আলোচনা প্রকাশ করেন তাই এ পর্যন্ত বিদ্যাপতি সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ গবেষণা। অবশ্য বিদ্যাপতি পদাবলীর মিত্র মজুমদার সংস্করণে বিমানবিহারী মজুমদারের বিদ্যাপতি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত সুকুমার সেনের 'বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ এবং 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠি' গ্রন্থ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় (১৩৬৭) সতীশচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাপতি বিচার' প্রবন্ধ বিদ্যাপতি সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণার অগ্রগতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। 'বাংলা সাহিত্যের কবিদের পরিচয় ও সময়', এবং 'বিদ্যাপতি-সমীক্ষা' গ্রন্থ দুটিতে বিদ্যাপতি-গবেষণার এই ধারাকেই আধুনিক কালে বহন করে নিয়ে এসেছেন ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে এই ব্যাপক গবেষণার সামগ্রিক ফলশ্রুতি এই যে, লছিমা প্রেমিক সহজিয়া সাধক বাঙালী-বৈষ্ণব গোস্বামী ঠাকুর বিদ্যাপতির নামে যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, সেই মিথ্যা পরিচয় থেকে বিদ্যাপতি অব্যাহতি লাভ করে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক পরিচয়ে চিহ্নিত হলেন—

প্রথমতঃ বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব নন, মিথিলার শৈব কবি।

দ্বিতীয়তঃ মিথিলার কামেশ্বর রাজাদের সভাকবিরূপে বিদ্যাপতি বহু রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। রাজ নামাঙ্কিত অনেকপদে পৃষ্ঠপোষকের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শিবসিংহ ও তাঁর পত্নী লছিমা দেবীর নাম আছে। তৃতীয়তঃ বিদ্যাপতি আনুমাণিক ১৩৮০ খ্রীঃ থেকে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

চতুর্থতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি অন্যান্য বিষয়ে যথা হরগৌরী ও গঙ্গা সম্পর্কে যেমন পদ রচনা করেছেন তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরূপে স্মৃতিশাস্ত্র, ইতিহাস গ্রন্থ, ভূপরিচয় গ্রন্থ, পত্রলিখন গ্রন্থ, ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থে তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং সংস্কৃত, মৈথিল, অবহট্ট প্রভৃতি বহুভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চমতঃ চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির মিলন সম্পর্কিত কিংবদন্তীমূলক আখ্যান বস্তুত মিথ্যা, চৈতন্যোত্তর কালের ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের মিলনই সম্ভবতঃ এই কিংবদন্তীর ভিত্তি।

আধুনিক গবেষণার ফলে বিদ্যাপতি অবাঙ্গালী বলে প্রতিপন্ন হলেও গবেষকগণ বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবি বলেই দাবী করেছেন। সে যুগের মিথিলা বৃহৎ বঙ্গের অধীন ছিল, এই যুক্তিতে বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নয়।' রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলেই বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবি বলে দাবী করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃতীয় সংস্করণে বিদ্যাপতিকে মিথিলার কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও পরিশেষে ভালবাসার অভিমানে বলেছেন —"যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হয়েছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তি সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সঙ্কীর্তন করিয়া আসিতেছেন, এবং যে সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফলকথা যিনি যাহা বলুন আমরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিয়া বোধ করিব।" দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে অনুরূপ ভালবাসার দাবী জানিয়ে বলছেন— "বিদ্যাপতির সমাধি স্তম্ভ উঠিলে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণ তাঁহাকে লইয়া

গর্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে। বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ, ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন। আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতো সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিকগণ এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ১৩১৪ সালে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বিদ্যাপতির সুর পরিবর্তনের যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন— "মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাঁহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমনকি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়ার্সন মূল বিদ্যাপতির যে সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংলা পদাবলীতে তাহার দুই চারিটির ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মত হইয়া যায় নাই। কারণ একটা মূল সুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। এই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি। আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।"

(খ) চণ্ডীদাস সমস্যা

উনবিংশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণায় প্রধান আলোচ্য সমস্যা যেমন বিদ্যাপতি, বর্তমান শতকে তেমনি মুখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে চণ্ডীদাসকে নিয়ে। গত শতকের গবেষণায় বিদ্যাপতির পাশাপাশি চণ্ডীদাসও আলোচিত হয়েছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস সম্পর্কে সংশয় ও সমস্যা দেখা দিয়েছে বর্তমান শতকে এসে। পূর্ববর্তী শতকে চণ্ডীদাসের কবিব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয় নি, তার ফলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। ১৮৫৮ খ্রী: রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' প্রবন্ধে বিদ্যাপতির সঙ্গে ভাষাগত তুলনা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন মূলক পদ উদ্ধৃত করে কিংবদন্তী প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ রাজেন্দ্রলাল ও হরিমোহনের আলোচনারই প্রতিধ্বনি, রামী ও চণ্ডীদাসের প্রণয় কাহিনীমূলক কিংবদন্তীর উল্লেখ এখানেও আছে। ১৮৭৩ খ্রী: Indian Antiquary পত্রিকায় John Beams, Vaisnava poets of Bengal প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্পর্কে অতিরিক্ত যা বলেছেন, তা হল,—'১৪১৭ খ্রী: চণ্ডীদাসের জন্ম হয়, আর তাঁর মৃত্যু হয় ৬২ বছর বয়সে ১৪৭৮ খ্রী:।' রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের প্রথম সংস্করণে রামী-চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ বর্জন করে চণ্ডীদাসের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলছেন—"চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুল্লীপুর থানার অব্যবহিত পূর্বদিকে অবস্থিত। এই গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্তমান আছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্য দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী।...চণ্ডীদাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতির জন্ম পরিগ্রহ বিষয়ক অনুমান যদি স্থির হয় তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন স্থির করিতে হইবে। কারণ উঁহারা একই সময়ে বর্তমান ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে।" বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসু ও The Literature

of Bengal গ্রন্থে রমেশচন্দ্র দত্ত অতিরিক্ত কোন চণ্ডীদাস পরিচয় দিতে পারেন নি, কেবল রমেশচন্দ্র চণ্ডীদাস নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে চণ্ডীদাসকে শক্তি-সাধক বলে অভিহিত করেছেন। গত শতকের শেষদিকে ১৮৯৬ খ্রীঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক নতুন প্রসঙ্গ আছে। কিংবদন্তীর আলোচনায় গবেষকের বিচারবুদ্ধির পরিবর্তে দীনেশচন্দ্রের আবেগময় ভাবুকতা যদিও বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে, তথাপি উনবিংশ শতকের চণ্ডীদাস সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'একক চণ্ডীদাসের' নিঃসংশয় বিশ্বাসকে একালেও বহন করছেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। উনবিংশ শতকে চণ্ডীদাসের একক কবিব্যক্তিত্ব কোন সংশয় সৃষ্টি করে নি, কিন্তু বিংশ শতকে চণ্ডীদাসের পদ যত আবিষ্কৃত হতে লাগল, সংশয় ও সন্দেহ ততই বৃদ্ধি পেল, চণ্ডীদাস গবেষণা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে পড়ল। প্রাগাধুনিক পদ সংকলনগুলির মতো আধুনিক পদ সংকলনগুলিতে চণ্ডীদাসের পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন অনাধুনিক প্রাচীন সংকলন ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ ছিল না, রাধামোহন ঠাকুরের সংকলন পদামৃতসমুদ্রে চণ্ডীদাসের নামে ১২টি পদ বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৮টিতে দাঁড়াল, তেমনি আধুনিক কালে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের চণ্ডীদাস সংকলনের ১৮৬টি পদ রমণীমোহনের পদসংগ্রহে বৃদ্ধি পেল ২৪০টিতে এবং পরবর্তী সংকলন নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস সংগ্রহে ৮৩৮ পদসংখ্যায় এসে দাঁড়াল। এ ছাড়া ১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চণ্ডীদাসের ভণিতায় ৭১টি পদ সমন্বিত রাসলীলার পালা, ও একই বছরে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত ১৪টি পদ সমন্বিত রামী চণ্ডীদাস সংক্রান্ত সহজিয়া রাগাত্মিকা প্রেমের পদ, ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী কর্তৃক চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কৃষ্ণের জন্মলীলা ও রাধার কলঙ্কভঞ্জন বিষয়ক দুখানি পালাগানের আবিষ্কার চণ্ডীদাসের একক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করল। এই সন্দেহ বদ্ধমূল হল ১৩২৩ সালে, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক ১৩১৬ সালে আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আত্মপ্রকাশে। এর দশ বছর পর ১৩৩৩ সালে মণীন্দ্রমোহন বসুর দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত বৃহৎ পালার আবিষ্কার চণ্ডীদাসের বহু ব্যক্তিত্বকে নিঃসংশয় করে তুলল।

বর্তমান শতকের গবেষকগণ চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানের জন্ত বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা হল এই গবেষণার প্রধান পীঠস্থল। ১৩১৮ সালে বসন্তরঞ্জন রায় পূর্বোক্ত পত্রিকায় প্রথম 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক প্রবন্ধটিতে তাঁর আবিষ্কার ঘোষণা করেন। ১৩২৫ সালে সতীশচন্দ্র রায় ঐ পত্রিকায় 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক প্রবন্ধে বসন্তরঞ্জনের আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়' শিরোনামে প্রবন্ধ দেখা দিল ১৩২৬ সালে ঐ পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায়ের নামে। ১৩২৬ ও ১৩২৯ সালে 'চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে সমর্থন করে চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত দিলেন। ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ সালে মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে আবিষ্কৃত পালার পরিচয় দান প্রসঙ্গে সমাধানমূলক মতবাদ দিলেন। ১৩৩৬ সালে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনা করলেন। ১৩৪০ সালে সুকুমার সেন 'শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে ও ১৩৫৭ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সমস্যার মনোমত সিদ্ধান্ত দিলেন। ১৩৪২ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় 'চণ্ডীদাস' শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করে কৃষ্ণকীর্তনের বিরোধিতা করেন। ১৩৪৩ সালে মহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্তনের পদ পরিচয় দেন। ১৩৪৪ সালে বসন্তরঞ্জন রায় 'চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করেন। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও চণ্ডীদাস নিয়ে বিভিন্ন গবেষক প্রচুর আলোচনা করেছেন। আর অতিরিক্ত তথ্য বিবৃত না করে চণ্ডীদাস গবেষণায় এ যুগের প্রধান প্রধান গবেষকের সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করা যাক। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গবেষকের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতাকে অধিক মূল্য দিয়ে এ সম্পর্কে বলেছেন—"আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন অভিন্ন নহে" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি বলেছেন—"অপরিণত বয়সের চাপল্যে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় অতি অশ্লীল কাব্য রচনা করেন, পরে শিল্পী স্বভাবের ক্রমবিবর্তনের ফলে পরিণত বয়সে তিনি অপূর্ব প্রেমভাব সমৃদ্ধ পদসাহিত্য রচনা করেন।" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ দীনেশচন্দ্রের এই মতকেই সমর্থন করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায় চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানে তিনজন চণ্ডী-

দাসকে স্বীকার করেছেন। চৈতন্যপূর্ববর্তী দুজন চণ্ডীদাসের একজন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ও অন্যজন স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পদ রচয়িতা প্রথমশ্রেণীর কবি পদাবলীর চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত নিকৃষ্ট পদ চৈতন্যপরবর্তী যুগের দীন চণ্ডীদাস। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেও তিনজন চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন; একজন প্রাকচৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস এবং অপর দুজন চৈতন্যপরবর্তী যুগের দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদ ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে উৎকৃষ্ট চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পরিণত হয়েছে। দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস এঁদের মতে একজনই।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে চণ্ডীদাস মোট দুজন। একজন প্রাকচৈতন্যযুগের উৎকৃষ্ট পদরচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং অন্যজন চৈতন্যপরবর্তীকালের নিকৃষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন কবি দীন চণ্ডীদাস। বড়ুর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন। চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানে মণীন্দ্রমোহন বসুর মত এই যে, বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস দুজন। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের বড়ু চণ্ডীদাস এবং অপরজন চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি প্রচলিত পদাবলী ও পালাগানের রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস। চৈতন্যপূর্ববর্তী উৎকৃষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন কোন পদাবলীর চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নি; তাঁর মতে চৈতন্যভাবানুপ্রাণিত দীন চণ্ডীদাসের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদই চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলী। দীন চণ্ডীদাস উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় ধরণের পদেরই স্রষ্টা। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে প্রাকচৈতন্য যুগের উৎকৃষ্ট পদ রচয়িতা পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্যদেব আস্বাদ করতেন; চৈতন্যদেবের সমকালে বর্তমান ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। চৈতন্যপরবর্তী দুজন চণ্ডীদাসের মধ্যে একজন পালাগানের লেখক দীন চণ্ডীদাস, এবং অপরজন গোস্বামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দ্বিজ চণ্ডীদাস। সহজিয়া চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র কোন কবিব্যক্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে চৈতন্যপরবর্তী যুগের বহু সহজিয়া বৈষ্ণবের পদ চণ্ডীদাস নামটিকে আশ্রয় করে সম্মিলিত হয়েছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে তিন যুগে তিন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। প্রাকচৈতন্য যুগের বড়ু চণ্ডীদাস, চৈতন্যসমসাময়িক দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী নিকৃষ্ট পদ রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চণ্ডীদাস চার জন। চৈতন্য পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস যাঁর পদ চৈতন্যদেব আস্বাদ

করতেন, এছাড়া ছিলেন সহজিয়া চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যপরবর্তীকালের পদও পালাগানের রচয়িতা। ডঃ সুকুমার সেন ১৩৪৭ সালের বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধে সংশয় নিরসন করে বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্ততঃ আর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন— তাঁহাকে দীন অথবা দ্বিজ যে নামে পরিচিত করা যাক না কেন যিনি কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হইয়াও বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদভাগবত, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, সিদ্ধপুরাণ ও বিবিধ গোস্বামীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণলীলা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবি সনাতন, রূপ, জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণের রচনার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।" সুকুমার সেন এই দুজন চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর কিয়দংশ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদের পরিবর্তিত রূপ, কিয়দংশ আবার জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রামগোপাল দাস, যদুনন্দন দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের উৎকৃষ্ট পদ,—যা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত। সহজিয়া চণ্ডীদাসের কোন পৃথক অস্তিত্ব সুকুমার সেন স্বীকার করেন নি; চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদগুলি একাধিক সহজিয়া কবির সাধনসংকেত ঘটিত পদের রূপান্তর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্তমান পুঁথি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন "আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীঃ দিকে লেখা হইয়াছিল।" কিন্তু মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এর থেকে অনেক প্রাচীন। সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়কের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আর অর্বাচীন চণ্ডীদাস সম্পর্কে তাঁর মত এই যে "পদকর্তা যে অন্ততঃ ১৬৬০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা চলে।" এঁর সঙ্গেই বাংলা দেশের ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনের মিলন হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। সম্প্রতি 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' গ্রন্থে ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় বহু চণ্ডীদাসের ভিতর থেকে 'বড়ু' ও 'দ্বিজ'কে গ্রহণ করে 'গণ্য-নগণ্য' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান শতকে চণ্ডীদাসের কাব্যালোচনার চেয়ে গবেষকদের চণ্ডীদাস সমস্যার আলোচনাই বেশী। কিন্তু এত গবেষণা সত্ত্বেও চণ্ডীদাস সম্পর্কে কোন সংশয়হীন নিশ্চিত সমাধান এখনও সম্ভব হয় নি।

গোবিন্দদাস সমস্যা

আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণায় বিদ্যাপতিকে নিয়ে উনবিংশ শতকে ও চণ্ডীদাসকে নিয়ে বিংশ শতকে যত সমস্যা ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে অন্য কোন বৈষ্ণব পদকর্তাকে নিয়ে এত বিচার ও আলোচনা হয় নি। তবে বর্তমান শতকে একটি ভিত্তিহীন সমস্যা দেখা দিয়েছিল গোবিন্দদাস কবিরাজকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬৯ খ্রী: হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে গোবিন্দদাসের প্রথম নামোল্লেখ মাত্র আছে; এর পর ১৮৭১ খ্রী: বঙ্গভাষার ইতিহাস গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাসের বিস্তৃত পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন—"গোবিন্দদাস কবিরাজ বুধুরী গ্রামনিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন।' ৮৭৮ খ্রী: রচিত রাজনারায়ণ বসুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় ও ১৮৮০ খ্রী: রমেশচন্দ্রের The Literature of Bengal গ্রন্থেও গোবিন্দদাসের উল্লেখ আছে। গত শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গোবিন্দদাস সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে। ১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় এবং ১২৮২ সালের বান্ধব পত্রিকায়, গোবিন্দদাসের জীবনী, কালনির্ণয় সম্পর্কিত গবেষণা আছে। ১২৯৯ সালে নব্যভারত পত্রিকায় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীও অনুরূপ গবেষণা করেছেন। ১৩০০ সালে নব্যভারত পত্রিকায় হারাধন দত্ত 'বঙ্গের বৈষ্ণব কবি' প্রবন্ধমালায়, ও ১৩১১ সালে প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি' প্রবন্ধমালায় গোবিন্দদাসের পরিচয় নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেন। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় গোবিন্দদাস সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। কিন্তু ১৩১১ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গোবিন্দদাসের বাঙ্গালী পরিচয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বিদ্যাপতির মতো গোবিন্দদাসকে মৈথিলী প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। মিথিলায় গোবিন্দদাস ঝা নামক মৈথিলী কবির কয়েকটি পদই তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ। ১৩১১ সালের ভারতী পত্রিকার পৌষসংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ করে গোবিন্দদাস কবিরাজকে বাঙ্গালী কবি বলেই প্রতিপন্ন করেন।

কিছুকাল নিবৃত্ত থাকার পর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আবার গোবিন্দদাস কবিরাজকে মিথিলার কবিরূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি মোট পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসের মাসিক বসুমতীতে, ১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, ১৯৩০ খ্রী: 'Modern review তে একটি করে মোট তিনটি এবং ১৩৩৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় দুইটি—এই মোট পাঁচটি প্রবন্ধ রচনা করে গোবিন্দদাস কবিরাজের বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই অপচেষ্টার প্রতিবাদে সতীশচন্দ্র রায় বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৩২) 'মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং ১৩৩৩ সালের ভারতী পত্রিকায় গোবিন্দদাস কবিরাজকে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিরূপে প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় সতীশচন্দ্র রায়ের দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সুকুমার সেন 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই অমূলক সংশয় ভিত্তিহীন প্রমাণ করে প্রচুর তথ্য ও দৃঢ় যুক্তি সহকারে গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রীখণ্ডের বাঙ্গালী কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা কেবল প্রতিবাদ প্রবন্ধ নয়, এই দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধটি গোবিন্দদাসের বিস্তারিত জীবন ও কাব্যপরিচয় হিসেবেও বিশেষ মূল্যবান। গোবিন্দদাস সম্পর্কে সর্বাধুনিক পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়েছে বিমানবিহারী মজুমদারের রচিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থের ভূমিকায়

(ঘ) অন্যান্য সমস্যা

সমস্যাপ্রধান পূর্বালোচিত তিনজন বৈষ্ণব কবি ছাড়াও অন্যান্য বহু খ্যাত অখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে আধুনিক কালে অনেক গবেষণা হয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের গোষ্ঠি পরিচয় থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিপরিচয়ে উদ্ঘাটিত করে তোলাই এই সমস্ত গবেষণার আধুনিক উদ্দেশ্য। গবেষণাগুলি যে সবক্ষেত্রে নির্ভুল তা নয়, কিন্তু এই অনুসন্ধানের চেষ্টা প্রশংসনীয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিজীবনী রচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব কবিকে নিয়ে গবেষণার এই আধুনিক ঔৎসুক্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতকে বিপুল সার্থকতা নিয়ে দেখা দিল। এর ফলে বহু অখ্যাত কবিও নিজের স্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

৮৫২ খ্রীঃ রঙ্গলাল জাতীয় সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরব কীর্তন করে 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে যে গবেষণা গ্রন্থ বীটন সোসাইটিতে পাঠ করেন, সেখানে গীতগোবিন্দ ও চৈতন্যচরিতামৃতের নাম থাকলেও গ্রন্থরচয়িতাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা বা উল্লেখ নেই। ১৮৫৩ খ্রীঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে গীতগোবিন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের আদি কবিকুলগুরু জয়দেবের জীবন সম্পর্কে কিংবদন্তিনির্ভর আলোচনা করেছেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহে 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে ভাষাগত তুলনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামোল্লেখ মাত্র করেছেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে রায়শেখরের উল্লেখ আছে। ১৮৭১ খ্রীঃ রচিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস গ্রন্থে পূর্বোক্ত বৈষ্ণব কবিসমূহ ছাড়াও বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, বৈষ্ণবদাস প্রমুখ অতিরিক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আছে। ১৮৭৮খ্রীঃ রাজনারায়ণ বসু বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রায়শেখর, নরহরি দাস, বৈষ্ণব দাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া গতশতকের সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে যথা রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) রমেশচন্দ্রের 'The Literature of Bengal' (১৮৮০) ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) প্রভৃতি গবেষণা গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

গত শতকের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে খ্যাত অখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে। ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রামদাস সেনের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ' প্রবন্ধটি ষড়গোস্বামীর জীবন পরিচয় ও রচনাপরিচয় বিষয়ক গবেষণা। একই সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানদাস' ও 'বলরাম দাস' নামে যে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে বৈষ্ণব কবি দুজনের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কিত গবেষণা অপেক্ষা কাব্য পরিচয়মূলক সমালোচনাই প্রধান। ১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় 'রায়বসন্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি বসন্ত রায় রচিত ১০টি কবিতার বিজ্ঞাপন। ইতিপূর্বে রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি বলে যে মত প্রচারিত ছিল এই প্রবন্ধটিতে সেই মত খণ্ডন করে রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতিকে পৃথক কবি বলে প্রমাণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'চণ্ডীদাস, বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে এবং ১৩১৬ আলোচনা পত্রিকায় লালগোপাল মিত্রের 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতির ভিন্নব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত অনুরূপ গবেষণা লক্ষ্য করা যায়।

১২৮৯ সালের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষের "বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটির প্রথমাংশ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবি এবং রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি চৈতন্যসমসাময়িক ভক্ত এবং গোবিন্দদাস, রায়শেখর, রায়বসন্ত প্রমুখ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিপ্রধানদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এছাড়া প্রবন্ধটিতে বাসুদেব ঘোষ, প্রসাদ দাস, জ্ঞানদাস, সুখময় দাস, কিঙ্কর দাস, রামচন্দ্র দাস, রামানন্দ, যদুনাথ দাস, দুর্লভ দাস, রাধাবল্লভ দাস, মুরারি গুপ্ত,

চম্পতিনাথ, গোপালদাস, বংশীদাস, লোচনদাস, নয়নানন্দ দাস, বাসুদেব দাস, প্রেমদাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন দাস, নরোত্তম দাস, রসরাজ খান, পীতাম্বর দাস, বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, গৌরী দাস প্রমুখ কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে।

১২৯৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ক্ষীরোদ রায়চৌধুরী 'ঘনশ্যাম দাস' ও 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' প্রবন্ধে গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম ও মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচনার পরিচয় দিয়েছেন।

১৩০০ সালের নব্যভারত পত্রিকায় হারাধন দত্ত 'বঙ্গের বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক গবেষণা প্রবন্ধে জ্ঞানদাস, লোচন দাস ও গোবিন্দদাসের জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৩০৩ সালে একই পত্রিকায় অচ্যুতনারায়ণ রায়চৌধুরী বলরাম দাসের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বলরামের ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেন।

প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৮ সালে মনোরঞ্জন গুহ রচিত 'রায় রামানন্দ' প্রবন্ধ রামানন্দ রায় সম্পর্কিত তথ্যপূর্ণ গবেষণা। ১৩১১-১২ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় নরহরি সরকার, লোচন দাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরঞ্জন, গোপাল দাস, আত্মারাম নৃসিংহানন্দ প্রমুখ শ্রীখণ্ডের ভক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব কবিদের জীবন ও রচনা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা প্রকাশ করেছেন।

আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাক্ষেত্র হল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। খ্যাত অখ্যাত, মুখ্য গৌণ অসংখ্য বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে এই পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা হয়েছে।

১৩০৪ সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'নরোত্তম ঠাকুর,' ১৩০৫ সালে কালিদাস নাথের 'বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ', একই সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'স্ত্রীকবি মাধবী', ১৩০৬ সালে আনন্দনাথ রায়ের 'ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর', ১৩১৬ সালে সতীশচন্দ্র রায়ের 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ', ১৩২২ সালে ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের 'বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস', এবং সতীশচন্দ্র রায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এর নিদর্শন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস সম্পর্কিত সমস্তালোচনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকার গুরুত্ব

আগেই দেখানো হয়েছে। প্রবাসী, বসুমতী, ইত্যাদি বর্তমান শতকের পত্রিকার গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে স্বীকৃতির যোগ্য।

গত শতকে এবং বর্তমান শতকের পত্র পত্রিকাগুলিতে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কিত যে সমস্ত গবেষণাপ্রচেষ্টা বিপুল আকারে দেখা দিয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ করা গেল গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগবন্ধু ভদ্রের বৈষ্ণব কবি পরিচয়মূলক বিস্তৃত আলোচনায় এবং সতীশচন্দ্রের সম্পাদিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে বৈষ্ণব কবি সম্পর্কিত বিস্তারিত গবেষণায়। আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার পূর্ণাঙ্গ পরিণতিরূপে উক্ত গ্রন্থদ্বয় স্মরণীয়। এরই সাম্প্রতিক পরিণাম ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের বৈষ্ণব কবিপ্রসঙ্গগুলিতে লক্ষণীয়।

সমালোচনার ধারা

আধুনিক কালে বৈষ্ণব কবিজীবন সম্পর্কে যেমন প্রচুর গবেষণা ও ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে তেমনি কবিকে জানার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব আস্বাদনের বিপুল প্রয়াসের ফলে গত শতকে ও বর্তমান শতকে বৈষ্ণব কবি ও কাব্য সম্পর্কে সমালোচনার একটি ধারাও রচিত হয়েছে। বস্তুত আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতাদের পাশে বৈষ্ণব পদকারদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আধুনিক গবেষণার দ্বারা বৈষ্ণব কবিদের যেমন মহাজন সাধকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি বৈষ্ণবপদাবলীকে মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণ ও আলঙ্কারিক নিয়মবন্ধন থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ লৌকিক সাহিত্যের মানদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়েছে। এইকারণে দেখা যায় চৈতন্যোত্তর কবিদের তুলনায় প্রাকচৈতন্যযুগের কবিরা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বেশী সমাদৃত ও বহুলালোচিত হয়েছেন। যে সাহিত্য সৌন্দর্যের নিরিখে কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ সংস্কৃত রসসাহিত্যের রচয়িতাগণ এ যুগের বহু আলোচিত কবি এবং যে মানবীয় রসের বিচারে মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, মেঘদূত, কাদম্বরী আধুনিক কালে বিপুল সমাদরে অভ্যর্থিত, ঠিক সেই কারণেই জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা এ যুগে প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হয়েছে। এ যুগের সমালোচকেরা বৈকুণ্ঠের বৈষ্ণবীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তা পদরত্নাবলীর ভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য থেকেই উপলব্ধি করা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—"চৈতন্যদেব জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেন না তখন সে ধর্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর

এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও ও পরবর্তী, জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনগ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

এমন বলিতেছি না যে, চৈতন্যের পূর্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম কেবল মধুর রসসর্বস্ব,—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদির তখনও নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। অন্য রসের যে প্রয়োজন তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন, এবং তাহাই তাঁহারা গীত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা অন্যরসের বড় আলোচনা করেন নাই।'

আধুনিক কালের সমালোচকেরা রাধাকৃষ্ণকে ঐশ্বরিক তত্ত্বমূর্তি অপেক্ষা বিশুদ্ধ মানব মানবী রূপেই দেখতে চেয়েছেন। ১২৮৪ সালে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত ভারতী পত্রিকায় 'বঙ্গসাহিত্য' নামক সমালোচনায় সমালোচক বৈষ্ণব কবিতাকে মধুর এবং শিল্পগুণান্বিত স্বীকার করেও এর স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে বলেছেন—'কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাপারটি যে স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নই। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।' তিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে দেবত্ব বা আধ্যাত্মিকতা দেখতে পান নি, বরং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতায় লৌকিক নায়ক নায়িকার ভাব লক্ষ্য করে বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ইন্দ্রিয়গত, অস্থিচর্মগত, এবং পৃথিবী হইতেও পার্থিব। শুধুমাত্র রূপলাবণ্যই যে প্রণয়ের প্রবর্তক, অশেষ প্রকার লীলাই যে প্রণয়ের জীবন, বসন্ত ও বর্ষাকাল যে প্রণয়ের উৎকর্ষ, যৌবনই যে প্রণয়ের সম্মান, দারুণ বিচ্ছেদের সময়েও 'নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার'ই যে প্রণয়ের দারুণ বিচ্ছেদ যাতনা, সে প্রণয়ের গরিমা কীর্তন করিতেও লজ্জা বোধ হয়।"

১৩০২ সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীঃ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত উমেশচন্দ্র বটব্যালের 'চণ্ডীদাসের কবিত্বাস্বাদন' নামক আলোচনায় চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক কবিতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে রজকিনী প্রেমের অসামাজিকতার দিকে ইঙ্গিত করে ঊনবিংশ শতকের নীতিবাদ প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া চণ্ডীদাসের বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিকে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনরূপ মিষ্টিক

বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে বিশুদ্ধ লৌকিক ও মানবিক প্রেমলীলা বলে ব্যাখ্যা করে সমালোচক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক প্রশ্নের (সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি / কোথা হতে পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ?) যথাযথ উত্তর :

"কৃষ্ণ রাধাকে নায়ক নায়িকা করিয়া চণ্ডীদাস যে সকল উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই তাঁহার নায়ক এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরী রামীই তাহার নায়িকা সন্দেহ নাই।"

আধুনিক কালে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন সম্পূর্ণ মানবিক। এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনাও তাই সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশুদ্ধ লৌকিক আদর্শে বিচারের বিরুদ্ধে একসময় মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তার উত্তরে বলেন্দ্রনাথ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন সেটা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

'বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানবরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদে- প্রতি অঙ্গের যৌবনসমৃদ্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ বর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে কেবল দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পরিপাট্য লইয়া। টানিয় বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা যায় না এমন নহে কিন্তু কাব্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন না।' (কৈফিয়ৎ) ঊনবিংশ শতকে আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা এটাই প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ বলে মনে হয়।

(২) দ্বিতীয়ত : আধুনিক যুগের বৈষ্ণব পদসংকলনগুলি যেমন পালামু সংকলন নয়, কবিমুখ্য সংকলন, তেমনি এযুগের বৈষ্ণবকাব্যের সমালোচনা কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পদের ভালোমন্দ বিচার নয়, সমগ্রভাবে কবির বিচার কোন একজন কবিকে নির্বাচন করে তাঁর সমস্ত পদগুলির মধ্য দিয়ে একটি কা চরিত্রকে নির্দেশ করা যেমন আধুনিক কবিমুখ্য পদাবলী সংকলনের উদ্দে আধুনিক সমালোচনাও তেমনি কোন এক নির্বাচিত বৈষ্ণব কবির পদগুলির ম থেকে তাঁর কবি স্বরূপকে আবিষ্কার করার সামগ্রিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণা যেমন বৈষ্ণব কবিকে গোষ্ঠিপরিচয় থেকে ব্যক্তি পরিচয়ের দিকে স্পষ্ট করে এনেছে, বৈষ্ণব কাব্যের আধুনিক সমালোচ

তেমনি পদ সৌন্দর্যের আস্বাদে মগ্ন থেকেও কবিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে সচেতন। এযুগের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ সমালোচনা তাই এক একজন স্বতন্ত্র কবিকে নিয়ে বলে, কবিনামেই প্রবন্ধগুলি পরিচিত।

(৩) **তৃতীয়ত ঃ** আধুনিক সমালোচনার একটি বিশেষ রীতি হল তুলনা পদ্ধতির ব্যবহার। সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখানোর জন্য তুলনার প্রয়োজন। কোন একজন কবির ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্য একজন কবির সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে দেখলে। এই কারণেই আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিতে তুলনামূলক বিচারের প্রয়োগ এত ব্যাপক। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় বঙ্কিম এর সার্থক পরিচালক। বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে এই বিশেষ সমালোচনা পদ্ধতি যত ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, অন্য আর কোথাও তা লক্ষ্য করা যায় না। বৈষ্ণব কবিদের একক ব্যক্তিত্ব নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে, তবে প্রাকচৈতন্য যুগের জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আলোচনাগুলি প্রায়ই তুলনার দ্বারা স্পষ্টীকৃত।

(ক) জয়দেব সম্পর্কে নবমূল্যায়ন

(বিদ্যাসাগর—বুদ্ধদেব বসু)

বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবিকুলগুরু জয়দেব ধর্মীয় কবিরূপে মধ্যযুগের ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে গোবিন্দদাসের কবিপ্রণাম পদে সমভাবেই শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপীয় সমালোচক ও অনুবাদকগণও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকিক বর্ণনায় মুগ্ধ হলেও অনেকেই শেষপর্যন্ত এ কাব্যকে অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক বলে অভিহিত করেছেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একটু দৃষ্টি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বাঙ্গালী সমালোচকগণও জয়দেবের কাব্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য, এরকম কোন অলীক কল্পনার বশবর্তী হয়ে নয়, বিশুদ্ধ লৌকিক সাহিত্যের বিচারে গীতগোবিন্দের কতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য ঠিক ততটুকু তাঁরা করেছেন। এযুগের গীতগোবিন্দের সমালোচনা আগের মতো হরিস্মরণে সরস নয়, বিলাস কলার কৌতূহলে কৌতূহলী।

১৮৫৩ খ্রীঃ প্রকাশিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জয়দেবের প্রশংসা করে বলেছেন:

"গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা, ও প্রসাদগুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিনী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব শক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নয়। বোধ হয় বাংলাদেশে যত সংস্কৃত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট।"

বিদ্যাসাগরের এই আলোচনার মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম ধরা পড়ল। তিনি জয়দেবের কাব্য সমালোচনায় কোন ভক্তিবাদী ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেন না, বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলেন। আধুনিক সমালোচকদের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ যুগে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যকে বৈকুণ্ঠের গান হিসাবে না দেখে লৌকিক প্রেমসাহিত্যরূপে দেখার প্রয়াস দেখা গেল, তেমনি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব সাধনার অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে না রেখে ঐতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে এনে ধর্মসংস্কারবর্জিত বিশুদ্ধ কবিত্বের বিচারে নবমূল্যদান করা হল। এর ফলে দেখা দিল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের বিপুল পার্থক্য।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কাব্যে তৃপ্ত হতেন, এই তথ্যটুকুতে তৃপ্ত হয়ে সারা মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচারকে স্পর্ধা বলে মনে করেছে। জয়দেবকে আধ্যাত্মিক কবি ও জয়দেবের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাবে পূজা করে এসেছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যবিচারের আহ্বান শোনা গেল বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে। আপাত প্রশংসা সত্ত্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তাই হল জয়দেব সম্পর্কে এ যুগের আধুনিক মত। ধর্মীয় সংস্কারের চশমা খুলে কাব্যরসিকের খোলাচোখে জয়দেবকে এই প্রথম দেখা হল। তাতে দেখা গেল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেব কালিদাস, ভবভূতির চেয়ে অনেক নীচে, আর তাঁর রচনারীতি যতটা প্রশংসনীয়, কবিত্বশক্তি তদনুযায়ী নয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রথম জয়দেবের আংশিকতা ধরা পড়ল; – জয়দেব যতটা কানকে ভোলায়, মনকে ততটা নাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের ঐ মন্তব্যই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত।

সুতরাং সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত মন্তব্যই জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক যুগের প্রতিনিধিত্বসূচক সমালোচনা। এক্ষেত্রে রীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ সুভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর কবিত্ব শক্তির ন্যূনতা সম্পর্কেও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত আছে। পরবর্তীকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতের সৌন্দর্যকে প্রশংসা করলেও তাকে বহিরিন্দ্রিয় বলেই নিন্দা করেছেন। বিদ্যাসাগর

(ক) জয়দেব সম্পর্কে নবমূল্যায়ন

(বিদ্যাসাগর—বুদ্ধদেব বসু)

বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবিকুলগুরু জয়দেব ধর্মীয় কবিরূপে মধ্যযুগের ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে গোবিন্দদাসের কবিপ্রণাম পদে সমভাবেই শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপীয় সমালোচক ও অনুবাদকগণও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকিক বর্ণনায় মুগ্ধ হলেও অনেকেই শেষপর্যন্ত এ কাব্যকে অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক বলে অভিহিত করেছেন; উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একটু দৃষ্টি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বাঙ্গালী সমালোচকগণও জয়দেবের কাব্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য, এরকম কোন অলীক কল্পনার বশবর্তী হয়ে নয়, বিশুদ্ধ লৌকিক সাহিত্যের বিচারে গীতগোবিন্দের কতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য ঠিক ততটুকু তাঁরা করেছেন। এযুগের গীতগোবিন্দের সমালোচনা আগের মতো হরিস্মরণে সরস নয়, বিলাস কলার কৌতূহলে কৌতূহলী।

১৮৫৩ খ্রী: প্রকাশিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জয়দেবের প্রশংসা করে বলেছেন:

"গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা, ও প্রসাদগুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিনী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব শক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নয়। বোধ হয় বাংলাদেশে যত সংস্কৃত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট।"

বিদ্যাসাগরের এই আলোচনার মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম ধরা পড়ল। তিনি জয়দেবের কাব্য সমালোচনায় কোন ভক্তিবাদী ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেন না, বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলেন। আধুনিক সমালোচকদের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ যুগে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যকে বৈকুণ্ঠের গান হিসাবে না দেখে লৌকিক প্রেমসাহিত্যরূপে দেখার প্রয়াস দেখা গেল, তেমনি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব সাধনার অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে না রেখে ঐতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে এনে ধর্মসংস্কারবর্জিত বিশুদ্ধ কবিত্বের বিচারে নবমূল্যদান করা হল। এর ফলে দেখা দিল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের বিপুল পার্থক্য।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কাব্যে তৃপ্ত হতেন, এই তথ্যটুকুতে তৃপ্ত হয়ে সারা মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচারকে স্পর্ধা বলে মনে করেছে। জয়দেবকে আধ্যাত্মিক কবি ও জয়দেবের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাবে পূজা করে এসেছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যবিচারের আহ্বান শোনা গেল বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে। আপাত প্রশংসা সত্ত্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তাই হল জয়দেব সম্পর্কে এ যুগের আধুনিক মত। ধর্মীয় সংস্কারের চশমা খুলে কাব্যরসিকের খোলাচোখে জয়দেবকে এই প্রথম দেখা হল। তাতে দেখা গেল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেব কালিদাস, ভবভূতির চেয়ে অনেক নীচে, আর তাঁর রচনারীতি যতটা প্রশংসনীয়, কবিত্বশক্তি তদনুযায়ী নয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রথম জয়দেবের আংশিকতা ধরা পড়ল; - জয়দেব যতটা কানকে ভোলায়, মনকে ততটা নাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের ঐ মন্তব্যই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত।

সুতরাং সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত মন্তব্যই জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক যুগের প্রতিনিধিত্বসূচক সমালোচনা। এক্ষেত্রে রীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ সুভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর কবিত্ব শক্তির ন্যূনতা সম্পর্কেও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত আছে। পরবর্তীকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতের সৌন্দর্যকে প্রশংসা করলেও তাকে বহিরিন্দ্রিয় বলেই নিন্দা করেছেন। বিদ্যাসাগর

কোনরকম ব্যাখ্যা না করে জয়দেবকে কালিদাস ভবভূতির চেয়ে ন্যূন বলে যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে কালিদাস ও জয়দেবের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করে চমৎকার ব্যাখ্যার দ্বারা সেই সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করেছেন। বিদ্যাসাগর জয়দেবের বর্ণনারীতির প্রশংসা করে যা বলেছেন, রমেশচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে The Literature of Bengal নামক গ্রন্থে জয়দেব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাকেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। নবজীবন পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, এবং নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে দ্বিজেন্দ্রলাল বসু জয়দেবকে সপ্রশংস সমর্থন করেছেন। আবার বিদ্যাসাগর জয়দেবের যে অক্ষমতার নির্দেশ করেছেন, সাধনা ও ভারতী পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তাকেই আরও তীব্র ও তিক্ত বিরোধী আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

জয়দেবের স্বপক্ষ-প্রশংসা এবং বিপক্ষনিন্দা দুটোই অনুধাবন করা যাক। রমেশচন্দ্র দত্ত জয়দেবের কাব্যের সঙ্গীতগুণ ও চিত্রগুণ উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত শব্দের কঠিন উপলস্তর ভেদ করে জয়দেব যে সঙ্গীতের স্রোতস্বিনী ধারা প্রবাহিত করেছেন, তার প্রশংসা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র The Literature of Bengal গ্রন্থে লিখেছেন :

"The first thing that strikes the reader is the exquisite music of the songs. It is a master hand that wakes the lyre and the ear is pleased and ravished with a flood of the sof- test and sweetest melody before one comprehends the sense".

কেবল সুরসঙ্গীত নয়, সাহিত্যের অন্য উপাদান চিত্রধর্মিতা সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন :

"It is no less rich in its soft and voluptuous description. The blue waves of Yamuna, the cool shade of the dark some Tamal tree, the soft whisperings of the Malaya breeze, the voluptuous music of Krisna's flute, more melodious than the song of the Kokil from the neighbouring Bokul tree, the timid glances of the love-striken milk-maids that spoke of love, the fond workings of a lover's heart, the pangs of jealousy, the sorrows of separation, the raptures of reunion,

all these are clearly and vividly reflected in the song of the immortal bard of Birbhum.

এই বিস্তৃত সমালোচনায় জয়দেবের কাব্যের প্রাকৃত প্রেম ও জাগতিক সৌন্দর্যেরই প্রশংসা করা হয়েছে, অপ্রাকৃত প্রেমের আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ নেই। ১২৯৩ সালের অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীঃ নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত জয়দেব প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার গীতগোবিন্দের ভাষা ও ছন্দ এবং কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুরু, তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। এখনও বঙ্গের গীতিসাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গীতগোবিন্দ প্রবন্ধে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের তুলনামাত্র করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে ১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে মানস বিকাশ প্রবন্ধটিতে যা বলেছিলেন তাই পরে কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' শিরোনামে বিবিধ প্রবন্ধের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করেন তখন সে যুগের অনেক সমালোচক বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত তুলনামূলক সমালোচনায় বিদ্যাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চণ্ডীদাস, এবং সেই তুলনাও কেবল ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগার আলোচনা। কিন্তু বিদ্যাপতিকে জয়দেবের প্রতিযোগী নির্বাচন করে উভয় কবির ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার যে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করলেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' নামে প্রকাশিত হবার সময়ে অনেকখানি পরিবর্জিত ও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। জয়দেব সম্পর্কিত মন্তব্যের একটি পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির সংস্পর্শশূন্য বহিঃপ্রকৃতি যদি কেবল কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হয় তবে তাকে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ বলে অভিহিত করে 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন :

"এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের আসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ কালিদাস ও জয়দেব।" কিন্তু পরবর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তের যখন উদাহরণ দিলেন, তখন লিখলেন,—'ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব।' কালিদাস এখানে জয়দেবীয় দোষ থেকে মুক্তি লাভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংশোধন লক্ষণীয়। জয়দেবের ইন্দ্রিয়াসক্তির দোষ যে কালিদাসে নেই, তা তিনি স্বভাবতই বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত সকলেই কালিদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে জয়দেবের এই অক্ষমতার দিকটাই বিশেষ করে তুলে ধরেছেন। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমকথিত ইন্দ্রিয়পরতার উল্লেখ করে বলেছেন—"জয়দেবের ললিতলবঙ্গলতা ভালো বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজার কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে কাব্যের ইন্দ্রিয়পরতা ও আধ্যাত্মিকতা দোষ সম্পর্কে যা বলেছেন বলেন্দ্রনাথ জয়দেব প্রবন্ধে তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—'শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতি সূক্ষ্ম ধ্যানগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম'। বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমকথিত জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরতা দোষকেই বলেন্দ্রনাথ অন্যভাবে বলেছেন—"গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয় ন্যায়শাস্ত্র বর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন।' আর প্রমথ চৌধুরী জয়দেব প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সম্পর্ক অস্বীকার করে বলেছেন—"আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় নাই।' বঙ্কিমও বলেছেন—'যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।'

জয়দেবের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীঃ ভারতী পত্রিকায় এবং বলেন্দ্রনাথের 'জয়দেব' প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীঃ সাধনা পত্রিকায়। প্রমথ চৌধুরী গীতগোবিন্দ কাব্যের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত প্রচলিত মতকে প্রথমেই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দেহবর্ণনাই গীতগোবিন্দের মুখ্য উদ্দেশ্য। কালিদাসের

তুলনায় জয়দেবের বিরহবর্ণনা প্রাণহীন, সৌন্দর্য বর্ণনা গতানুগতিক উপমা প্রথানুগত, অর্থহীন ও কবিত্ব বর্জিত, ভাষা ভাবানুযায়ী নয়, কৃত্রিম এবং ছন্দ রিদম্‌হীন ও একান্ত পিচ্ছিল। প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যের বিলাসাতিরেক সম্পর্কে যে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করেছেন তা বঙ্কিমেরই সমর্থন। বলেন্দ্রনাথের জয়দেব-বিরোধিতার কারণ এই যে, প্রেমের ক্ষেত্রে জয়দেবের সম্ভোগান্ধ দেহ-সর্বস্ব দৃষ্টি যেমন খণ্ডিত, ছন্দপিচ্ছিল কাব্যবর্ণনার ক্ষেত্রেও জয়দেবের কাব্য ইন্দ্রিয়াতিরেকের জন্য ক্লান্তিকর। সর্বোপরি জয়দেবের কাব্যে নগ্নতার জঘন্য ইঙ্গিতকে নির্দেশ করে বলেন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের গোবিন্দগীতিকে অস্বীকার করেছেন।

জয়দেবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে তখন জয়দেব বিরোধিতার প্রতিবাদ দেখা দিল ১৯১৯ সালের নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে জিতেন্দ্রলাল বসুর 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে। বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক গীতগোবিন্দের কাব্যগৌরব ও অধ্যাত্ম-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে প্রবন্ধটিতে জয়দেব বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষপাতও আছে। অতঃপর জয়দেবের জয়ধ্বনি আবার উচ্চকিত হয়ে উঠল ডঃ সুশীলকুমার দের 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' প্রবন্ধে এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে।

জয়দেবের সপক্ষবাদী এবং বিপক্ষবাদীদের পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনায় যখন গত শতক ও বর্তমান শতক উচ্চকিত, সেই সময়ে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে জয়দেবের ব্যক্তিপরিচয় ও কাব্যপরিচয় উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীজয়দেব কবি' নামে যে নিরপেক্ষ গবেষণা ও সমালোচনাটি ভারতবর্ষে (১৩৫০) প্রকাশিত হয়, বর্তমান শতকে জয়দেব সম্পর্কে এটাই শ্রেষ্ঠ আলোচনা ও পরিণত গবেষণা।

অবশেষে জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক সিদ্ধান্তের সারাৎসার পাওয়া গেল বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকায় (১৩৬৬) জয়দেব সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিদগ্ধ মন্তব্যে—"জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অন্তরাগ তিনি এবং আধুনিকের পূর্বরাগ।"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নবমূল্যায়ন

(জগবন্ধু ভদ্র—শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

আধুনিককালে বৈষ্ণব কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে জয়দেবের যেমন সপক্ষ ও বিপক্ষ সমালোচকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্পর্কেও তেমনি বাদী প্রতিবাদীর দল দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগে জয়দেব সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্পর্কে তার চেয়ে আরও অনেকবেশী। আর সেই আলোচনা প্রায় সবক্ষেত্রেই তুলনামূলক। মধ্যযুগেও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিস্মরণে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অনেক সময়ে একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, তাঁদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও মিলনের কল্পিত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সে উল্লেখ সাদৃশ্যমূলক, বৈষম্যমূলক নয়, কারণ চৈতন্য আস্বাদিত কবিরূপে তাঁরা বৈষ্ণবগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত, কবিব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয়ে তাঁরা সম্মানিত নন। মধ্যযুগে সেইকারণে পার্থক্য বিচারের উদ্দেশ্যে তুলনামূলক আলোচনা হয় নি। কিন্তু এযুগে যে মুহূর্তে বৈষ্ণব গোষ্ঠীচেতনা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ কবিপরিচয়ে তাঁদের দেখা হল, সে মুহূর্তে তাঁদের কবিত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রশ্নটাও এসে পড়ল। গোবিন্দদাস কবিরাজ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তিনজনের সম্পর্কেই কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বন্দনাই ছিল প্রধান, বিচারটা মুখ্য হয়ে ওঠে নি। এযুগে দেখা দিল ব্যাখ্যা ও বিচার—বন্দনার পরিবর্তে দেখা দিল সমালোচনা।

১৮৫৮ খ্রী: রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রথম পাশাপাশি উল্লেখের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিন্তু ১৮৭২ খ্রী: জগবন্ধু ভদ্রের মহাজন পদাবলীর ভূমিকা প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত সেই তুলনা ছিল প্রধানতঃ উভয় কবির ভাষাগত তুলনা প্রসঙ্গে হিন্দী প্রভাবের আপেক্ষিকতা বিচার। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১) এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্য সংগ্রহ (১৮৭২) গ্রন্থেও এই ভাষাগত তুলনাই প্রধান। ১৮৭২ খ্রী:

জগদ্বন্ধু ভদ্র যখন 'মহাজন পদাবলী' সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন তখন সংকলকের দৃষ্টিতে উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য ছাড়াও অন্যান্য পার্থক্যগুলিও ধরা পড়ল। মহাজন পদাবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক সমালোচনায় প্রথমেই শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রশ্নটি দেখা দিল :

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে ? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ও রামলক্ষ্মণের মধ্যে কোন্ মূর্তি অধিক সুন্দর ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর। রামে যে সকল সৌন্দর্য আছে লক্ষ্মণে তাহা নাই। আবার লক্ষ্মণের অনেকগুলি সৌন্দর্য রামমূর্তিতে দৃষ্ট হয় না। অথচ উভয়ের মূর্তি সুন্দরের একশেষ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষে তাহাই দেখা যায়।" এরপর সমালোচক বৈদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনা করে বলেছেন—"সেক্সপীয়রের কাব্য যদি প্রকৃতির দর্পণ হয় তবে বিদ্যাপতিতে সেক্সপীয়রের লক্ষণ, আর যে সকল ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতিমধুর শব্দাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহা মিল্টনের লক্ষণ হইলে, চণ্ডীদাস মিল্টন।" বিদেশী কবিদের তুলনা প্রসঙ্গে হঠকারিতার পরিচয় থাকলেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যথার্থ বলে মনে হয়।

জগদ্বন্ধু ভদ্র এরপর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার যে তুলনামূলক লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছেন তার থেকে উচ্ছ্বাস ও উপমাগুলি বাদ দিলে যা থাকে তা উল্লেখযোগ্য :

"বিচিত্র ভাব, অলঙ্কার, শব্দচাতুর্য, প্রকৃতিদর্শন প্রভৃতিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। ইঁহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরীয়সী যে বোধ হয় তিনি যেন প্রকৃতির সমস্ত স্থল দর্শন করিয়াছেন।.......

"শব্দবিন্যাস প্রায় সর্বত্র সংস্কৃত ও মধুময়। কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিলে মনে হয় তিনি পড়িয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এবং কোন কোন স্থলে ভাষা প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একটি অলঙ্কার ব্যবহার করিতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং অনেক কষ্টে তত্তৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়।

"চণ্ডীদাসের কবিতাদেবী নানাভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব, ভঙ্গী তত নাই, রূপে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিত। এই শোভা কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দরসে প্লাবিত করে।

অতঃপর নর্তকীর উপমা দিয়ে সম্পাদক বলেছেন—'চণ্ডীদাসের ছন্দ বিশুদ্ধ তাল নয়, লঘু অনায়াসসাধ্য স্বাভাবিক। তাঁর বাক্য সংস্কৃত নয়, কিন্তু হৃদয়-গ্রাহী ও মধুময়। তাঁর কণ্ঠস্বর শিক্ষাসিদ্ধ নয়, কিন্তু বনচারী কোকিলের মতো স্বাভাবিক ও শ্রুতিসুখাবহ।"

এরপর উভয়ের কবিপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করে যা বলেছেন তা আজও অনস্বীকার্য—"চণ্ডীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন যে বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে এমন মগ্ন হইয়াছেন, চণ্ডীদাসকে বর্ণিত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করা দুষ্কর। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে অভিন্ন করিতে পারেন নাই। অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল। চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন।" সর্বশেষে একটি সুন্দর উপমা দিয়ে সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনামূলক সিদ্ধান্ত করলেন।—"বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্রগর্ভনিহিতা অমূল্যরত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ি সরোজিনী সদৃশা।'

জয়দেব সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গীতগোবিন্দ প্রবন্ধের মতো জগদ্বন্ধু ভদ্রের এই মূল্যবান সমালোচনাটিকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় সমালোচনা বলা চলে। বিদ্যাপতির ভাববৈচিত্র্য, নিসর্গপ্রীতি, শব্দমাধুর্য ও অলঙ্কার চাতুর্যের প্রশংসা করেও সমালোচক বিদ্যাপতির অতি আলঙ্কারিকতা ও অতিসচেতন কষ্টকল্পনা দোষের কথা বলেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের নিরাভরণ স্বাভাবিক অসংস্কৃত সৌন্দর্যেরই প্রশংসা করেছেন, কোন দোষের কথা বলেন নি। বিদ্যাপতির তন্ময়ত্ব (objectivity) ও চণ্ডীদাসের মন্ময়ত্ব (subjectivity) সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন তা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয়। স্পষ্ট করে না বললেও বিদ্যাপতির কাব্যরত্নের তুলনায় চণ্ডীদাসের নির্দোষ কমল সৌন্দর্যের প্রতি সমালোচকের পক্ষপাত অধিক।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সম্পর্কিত তুলনামূলক সমালোচনায় আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের প্রথম দিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী সমালোচকগণ কেউ চণ্ডীদাস ও কেউ বিদ্যাপতি সম্পর্কে পক্ষপাত দেখিয়েছেন। ১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত মহাজন পদাবলীর ভূমিকায় বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডীদাসের প্রতি জগদ্বন্ধু ভদ্রের বেশী পক্ষপাত দেখা গেল।

কিন্তু ১৮৭১ খ্রীঃ প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা করে যখন বলা হয় :

"চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলিতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহার গীতে সেরূপ অতি কম পাওয়া যায়। ইহার রচনা সাদাসিধা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক,—বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে হইবে।"—সেক্ষেত্রে বোঝা যায় চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির উপরই কবির পক্ষপাত বেশী। বিদেশী সমালোচকের কাছে চণ্ডীদাসের ধ্যানগম্ভীর পদের চেয়ে বিদ্যাপতির জীবনচঞ্চল বাসনা মধুর পদ বেশী আকর্ষণ করেছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ প্রকাশিত Indian Antiquary পত্রিকায় "The early vaisnava poets of Bengal" প্রবন্ধে John Beams বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা করে বলেছেন—"The style of the two poets is very much alike but there is perhaps more sweetness and life in Bidyapati".

১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্ব পত্রিকায় চণ্ডীদাস শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেখানে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সমালোচক অসমর্থ হয়েছেন। উভয়ের কাব্যসৌন্দর্য তাঁর কাছে তুল্যমূল্য। উপমা দিয়ে উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করে সমালোচক বলেছেন—"বিদ্যাপতির কবিতা সরোবরে অগাধ জলসঞ্চারী রোহিত সদৃশ আর চণ্ডীদাস সেই সরসী নীরে ভাসমান বিকশিত কমলতুল্য"। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় এরই বিপরীত রূপ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাপতির কাব্য সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গ-শোভা, আর চণ্ডীদাসের কবিতা সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান।

১২৮২ সালে অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীঃ বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রবন্ধে বিদ্যাপতি মিথিলার অবৈষ্ণব কবিরূপে প্রতিপন্ন হলেন। বাঙ্গালীর বৈষ্ণবীয় চেতনার উপর এ যে কত বড় আঘাত বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবিরূপে প্রমাণ করার ব্যস্ততা দেখেই তা বোঝা যায়। এই গবেষণার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমালোচনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এতকাল যে দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বিমুখী মনোভাব ছিল, তা এরপর থেকে ক্রমশঃ চণ্ডীদাসের দিকে একমুখী হয়ে পড়ল। বাঙ্গালীর কবি বিদ্যাপতির পরিবর্তে

বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠার্ঘ্য লাভ করলেন। ১২৮৪ সালের অর্থাৎ ১৮৭৭খ্রীঃ ভারতী পত্রিকায় গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গসাহিত্য' সমালোচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনায় চণ্ডীদাসের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে লিখলেন :

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি. তাঁহারা এখন হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যে সুকবি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি কারণ বিদ্যাপতি কৃতবিদ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক রত্ন গ্রহণ করিয়া পদাবলী গ্রথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস আপনার হৃদয় উৎস হইতে যাহা কিছু উৎসারিত হইয়াছে তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যাস করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতায় ছন্দপতন ও যতিপতন প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসে তাহা ভূয়োভূয়ো হইয়াছে। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুলিখিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম-উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত উল্লাসের সেরূপ প্রভেদ।"

১২৮৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হল। এই তুলনামূলক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত 'জনম অবধি হম' পদের সমুচিত প্রশংসা করলেও চণ্ডীদাসের কাব্যে না বলা বাণীর যে বেদনাঘন প্রেমের স্বর্গীয় রহস্য লুকানো আছে তার গীতিব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করে বিদ্যাপতির তুলনায় চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা করে যে রীতিতে জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও এই প্রবন্ধে ঠিক সেই রীতিতেই বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। জয়দেবের পাশে বিদ্যাপতিকে ঠিক যে যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে, বিদ্যাপতির পাশে চণ্ডীদাসকেও রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন।

'মানস বিকাশ' প্রবন্ধে জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —"জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।...জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ, বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়

পূর্ণ। জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।'... ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র পরে এই আলোচনাকে সংশোধন করে মন্তব্য করেছেন— 'আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।''

রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ রচনার সময় বঙ্কিমের আত্ম-সংশোধনের এই ইঙ্গিতটুকু কি গ্রহণ করলেন? বিদ্যাপতিকে তিনি জয়দেবের শ্রেণীভুক্ত করে নিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস সম্পর্কে অধিক সুপ্রযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা করলেন:

''বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরও অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম 'কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা।' তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া'।"

বিদ্যাপতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের মতই আংশিক ও একদেশদর্শী। বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে জয়দেবের তুলনায় অন্তর্মুখীন বলেছেন, আবার রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের তুলনায় বিদ্যাপতিকে বহির্জগতের কবি না বলে পারেন নি। জয়দেবের ভোগের পাশে বিদ্যাপতিকে বঙ্কিমের প্রণয়প্রাণ মনে হয়েছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের আন্তরিকতার কাছে বিদ্যাপতিকে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-হীন বাক্‌প্রগল্‌ভ মনে হয়েছে। বঙ্কিমের কাছে জয়দেবের বসন্তসুখের কাছে

বিদ্যাপতির গান বেদনার বর্ষাসঙ্গীত, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতির পাশে সায়াহ্নসমীরণের নিঃশ্বাস, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চণ্ডীদাসের বেদনা-বর্ষার পাশে বিদ্যাপতির গান বসন্তসম্ভোগের সুখহিল্লোল।

জয়দেব ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি যথার্থ হলেও বিদ্যাপতি সম্পর্কে দুজনের মন্তব্যই আংশিক সত্য। বিদ্যাপতি কালিদাসের মতোই একই সঙ্গে ভোগের ও ভোগবৈরাগ্যের কবি। বহির্মুখীনতা ও অন্তর্মুখীনতা, সুখ ও দুঃখ, ভোগ ও বৈরাগ্য সমস্তই বিদ্যাপতির কাব্যে পাওয়া যায়। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের সমন্বয়ে বিদ্যাপতি পূর্ণতর কবি। চণ্ডীদাসের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের জন্য বিদ্যাপতির এই পূর্ণতর রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান নি।

চণ্ডীদাসের মোহে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই সময়ে এমনই অন্ধ যে বিদ্যাপতি একান্ত উপেক্ষিত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে বসন্তরায় ও বিদ্যাপতির তুলনা করে বসন্ত রায়কেই সহজ সরল ভাষা ও স্বতঃস্ফূর্ত উপমা প্রভৃতির গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে বসন্ত রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হলেও চণ্ডীদাস সম্পর্কে পক্ষপাত আদ্যন্ত অব্যাহত আছে। বিদ্যাপতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষার মনোভাব পরে পরিবর্তিত হয়। ১২৯৮ সালে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির রাধা' প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনায় চণ্ডীদাসের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও বিদ্যাপতিকে প্রেমের গতি ও চণ্ডীদাসকে প্রেমের উত্তাপ বলে বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ মধুর ও নবীনের কবি বিদ্যাপতিকে গভীর ও ব্যাকুলের কবি চণ্ডীদাসের পরিপূরক করে তুলেছেন। আগের মতো না হলেও এখানেও চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি সূক্ষ্ম পক্ষপাত বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ প্রকাশের দুবছর পরে ১২৯৬ সালের অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ভারতী ও বালক পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো চণ্ডীদাসের প্রতি এত বেশী পক্ষপাত নেই। এ বিষয়ে সমালোচকের দৃষ্টি সতর্ক। বিদ্যাপতির বিরহ বিষয়ক পদাবলী আলোচনা করে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পক্ষপাত দূর করার চেষ্টা আছে। কিন্তু তবুও সমস্ত প্রবন্ধটিতে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বারবার ধরা পড়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে সুখের কবি বিদ্যাপতির চেয়ে দুঃখের কবি চণ্ডীদাসই

শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন—"চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ করে সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নায়িকার পূর্বরাগে নায়কের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বোঝা যায় বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চদরের কবি।" শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যের তুলনায় চণ্ডীদাসের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে রবীন্দ্রনাথের মতোই বলেছেন—"লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।"

গত শতকের শেষে বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ডীদাসের প্রভাব যে জয়ী হয়েছিল তা দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) গ্রন্থ থেকেই ধরা পড়ে। এ যুগে বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাস যে কিছুকালের জন্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন সেকথা উল্লেখ করে আবেগের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছেন :

"কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কন ঢাকা পড়িয়াছেন, কতদিনের জন্য পোপের যশে সেক্সপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন। চারুচিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয় কিন্তু মানস সৌন্দর্য ও গরিমা সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নয়।"

১৩১১ সালে ভারতী পত্রিকায় 'চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ও উপমা অলংকরণের চেয়ে চণ্ডীদাসের স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বভাবভঙ্গীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থেও বলেছেন—"কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাঁটি প্রেমিক, আড়ম্বরহীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি—বঙ্গদেশের গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর চণ্ডীদাসের কবি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যখন সংশয় দেখা দেয় তখন এই ধরণের পক্ষপাত ত্যাগ করে বিদ্যাপতি সম্পর্কে আবার নতুন বিচার দেখা দেয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আলোচনায় মধ্যযুগের কবিসার্বভৌম বিদ্যাপতিকে রাজসভার কবিরূপে নবপ্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে।

গতশতকের সমালোচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এত বেশী তুলনীয়

হয়েছিলেন যে ক্রমশঃ এই একঘেয়ে তুলনার প্রথাগত চাপে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে পূর্বোক্ত কবি দুজন এক এক শ্রেণীর কবিতার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরূপে প্রতীক চরিত্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান শতকে চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভবের ফলে বহু চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্বকল্পিত চণ্ডীদাসের প্রতীকী ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে গেল। একক চণ্ডীদাসের পরিবর্তে বড়ু চণ্ডীদাস, প্রাকচৈতন্য পদাবলীর চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি পৃথক পৃথক চণ্ডীদাসের রচনা বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক পৃথক সমালোচনা দেখা দিল।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্রমোহন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবৃন্দ বিভিন্ন চণ্ডীদাসের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাদৃশ্য যেমন দেখানো হয়েছে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে; কিন্তু গত শতকের মতো শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের পক্ষপাত নিয়ে নয়, নিরপেক্ষ গবেষকের ঔৎসুক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতি সম্পর্কেও এই ঔৎসুক্য বর্তমান শতকে নতুন করে দেখা দিয়েছে। ১৩৩০ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচী পত্রিকায় বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেন সেখানে বিদ্যাপতি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি বিদ্যাপতির কাব্যসত্য উদ্ঘাটনেও সহায়তা করেছে। বহু প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্যাপতিকে তিনি তিন মূর্তিতে আবিষ্কার করেছেন। "এক মূর্তিতে তিনি পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন ত্রিহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসঙ্কল্প। আর এক মূর্তিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদিরসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদগদ হইতেছেন। তাঁহার আরও এক মূর্তি আছে; তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন—কীর্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরীনাশ করিয়া, রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন, এই সকল কথা তিনি তাঁর তৃতীয় মূর্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমালোচনায় বিদ্যাপতি যে বহু ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছেন সেখানে তিনি একাধারে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সন সম্পাদিত বিদ্যাপতির ৮১টি মৈথিল পদ এবং হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'কীর্তিলতা' গ্রন্থ অবলম্বনে 'বিদ্যাপতি' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তা বিদ্যাপতি সম্পর্কে আধুনিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি পদ সম্পর্কে আলোচনা করে বিদ্যাপতির জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কবির মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, সুনিপুণ বাকভঙ্গী ও শিল্পচাতুর্য সম্পর্কে সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রাজসভার কবিরূপে বিদ্যাপতির উপর রাজসভার দোষ ও গুণ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করে সমালোচক বিদ্যাপতির ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে কবিজীবনের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাপতির যে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—এ সম্পর্কেও সমালোচক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে মিথিলার বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পার্থক্য সম্পর্কেও সমালোচক নির্দেশ করেছেন। ১৩৫৯ সালে বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'কবি বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে তারাপদ মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা করে চণ্ডীদাসকে খাঁটি গীতিকবি ও বিদ্যাপতিকে নাট্যকার রূপে প্রমাণ করেছেন। বিদ্যাপতির অভিসার ও বিরহ পর্যায় দুটিকে অবলম্বন করে গীতিনাট্যের মতো বিদ্যাপতির পদ পর্যায়ে রাধাচরিত্রের বিকাশ দেখিয়ে বিদ্যাপতির নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আধুনিক কালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কিত সমালোচনার ধারা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নামক বিস্তৃত সমালোচনা গ্রন্থটিতে। পূর্বোক্ত লেখকের 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে বিদ্যাপতি সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিস্তৃত আয়তন লাভ করেছে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থের বিদ্যাপতি অংশটিতে। বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবন, ধর্মজীবন, ও কাব্যপর্যায় সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সরস বিশ্লেষণ করে সমালোচক বিদ্যাপতিকে 'প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি' ও 'মধ্যযুগের কবি সার্বভৌম' রূপে যে আধুনিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তা গতশতকের ও বর্তমান শতকের বিদ্যাপতি সমালোচনা ধারার একটি সার্থক ও সুন্দর উপসংহার।

বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনায় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চণ্ডীদাস সম্পর্কে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ আলোচনা হলেও বিংশ শতকে চণ্ডীদাসকে নিয়ে গবেষণা যত হয়েছে রসাত্মক সমালোচনা তার একাংশও হয় নি। চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানেই

সকলে ব্যস্ত ; কারণ কবির সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটিত হলে তবেই তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করা সম্ভব। তার ফলে বিংশ শতকে চণ্ডীদাস সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা খুব বেশী নেই। ১৩০২ ও ১৩১১ সালে ভারতী পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনা, ১৩৪২ সালের মাসিক বসুমতীতে অপূর্বকৃষ্ণ বসুর 'চণ্ডীদাসর রাধা' প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়া খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্রমোহন বসু, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, ও বিমানবিহারী মজুমদারের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থের চণ্ডীদাস অংশটিতে কোনরূপ সমস্যার উত্থাপন না করে বাঙ্গালীর চণ্ডীদাস-চেতনায় যে চণ্ডীদাসের নিত্য অবস্থান তাঁর বিভিন্ন পদাবলী পর্যায়ের চমৎকার আলোচনা করে 'কবিতাপস চণ্ডীদাস'কে আধ্যাত্মিক মনের কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গত শতক ও বর্তমান শতকের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমালোচনাধারায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ও স্মরণীয় সমালোচনা।

আধুনিক যুগের সমালোচনায় জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরাম দাস প্রমুখ অন্যান্য বৈষ্ণব পদকার

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবিরাই যদিও এযুগের প্রধান সমালোচ্য কবি, কিন্তু জ্ঞানদাস, বলরামদাস গোবিন্দদাস প্রমুখ চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরাও আধুনিক কালে আলোচিত হয়েছেন। বৈষ্ণব কবিদের গোষ্ঠী পরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত না রেখে ব্যক্তি হিসেবে দেখাই এযুগের আধুনিক যুগলক্ষণ। অবশ্য গতশতকের সমালোচকবৃন্দ প্রাকচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের সমালোচনায় অনেক বেশী অভিনিবিষ্ট ছিলেন, চৈতন্যপরবর্তী পদকারদের আলোচনায় ততবেশী মনোযোগ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি; এর ফলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তি পরিচয় উদ্ঘাটনের আধুনিক প্রচেষ্টা যতখানি প্রশংসনীয়, কবিতা বিচারের আগ্রহ ততখানি উল্লেখযোগ্য নয়। যেটুকু বিচারের চেষ্টা আছে হঠকারী মন্তব্য ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাকেও সুবিচার বলা চলে না। আসলে চৈতন্যপূর্বযুগের তিন কবিপ্রধান গতশতকের সমালোচনাকে এমনভাবে অধিকার করে রেখেছিলেন, যে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের গুরুত্ব তাঁদের কাছে অনেক ম্লান হয়ে গেছে। বিংশশতকে এসেই চৈতন্যোত্তর কবিরা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যসমালোচনায় যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করলেন।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে রচিত রঙ্গলালের 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থে চৈতন্যচরিতামৃতের নামোল্লেখ আছে; ১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' প্রবন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ আছে; ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত 'কবিচরিত' গ্রন্থে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, রায়শেখর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ করেছেন। এরপর 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭৩ গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাস, নরহরি দাস বৃন্দাবন দাস, শেখর রায়, বৈষ্ণব দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

১৮৭৩ খ্রী: রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' এই সমস্ত চৈতন্যোত্তর কবিদের আলোচনা আরও বিস্তৃতভাবে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় রায়শেখর, বাসুঘোষ, নরহরি দাস বৈষ্ণব দাস, যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের উল্লেখ আছে এবং গতশতকের শেষে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৯৬) চৈতন্যোত্তর কবিরা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছেন।

গতশতকের পত্রপত্রিকায় চৈতন্যোত্তর কবিদের নিয়ে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা দেখা দেয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। ১২৮০ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'জ্ঞানদাস' এবং 'বলরামদাস' শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ দুটির রচয়িতা যিনিই হোন 'জ্ঞানদাস' প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে আধুনিক যুগের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত মূল্যবান মন্তব্য থাকলেও জ্ঞানদাসের কাব্য সম্পর্কে সুবিচার করা হয় নি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদাসকে গৌণ কবি বলে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার মধ্যে সহৃদয় কাব্য বিচারের পরিবর্তে উনবিংশ শতকের নীতিবাদ মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে :

"জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। তথাপি আদরণীয়। কিন্তু তাঁহার কবিতা মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট।" এই নীতিবাদের জন্য জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত রসোদ্‌গারের পদ (মনের মরম কথা···) সমালোচকের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির অনুপযুক্ত বলে মনে হয়েছে, যদিও কবিতাটির ভাষাভঙ্গী ও বর্ণনারীতির প্রশংসা করে সমালোচক বলেছেন—'নিন্দ যাই মনের হরিষে', শ্রাবণ রজনীতে বৃষ্টির সময়ে 'কোকিল কুহরে কুতুহলে', 'ডাহুকী সে গরজে' এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ।" 'বলরাম দাস' প্রবন্ধেও জ্ঞানদাসের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে সমালোচক অনুরূপ নীতিবাদ প্রচার করে বলেছেন "দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা কবির ন্যায় বলরাম দাস অশ্লীলতা দোষ শূন্য নহেন। অশ্লীলতা দোষ শূন্য নহেন কিন্তু ইন্দ্রিয়পরতাশূন্য বটে। যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর বলরামে তাহা নাই। তথাপি বলরামে যাহা আছে তাহা বলরামের সময় ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া মার্জনা করিতে পারিলেও, তাঁহার কবিত্ব গৌরবানুরোধে মার্জনা করিতে পারিলেও আধুনিক কবির রচনায় তাহার মার্জনা করিতে পারি না। কোন আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টান্তানুবর্তী না হয়েন।"

অমূলক নীতিবাদের জন্ত বঙ্গদর্শনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটিতে জ্ঞানদাস ও বলরামদাস সম্পর্কে সুবিচার হয় নি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে আধুনিক যুগদৃষ্টি 'জ্ঞানদাস' প্রবন্ধটিতে ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে আধুনিক আকর্ষণের দুটি কারণ বক্তব্যটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। প্রথমত: সমালোচকের মতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যই একমাত্র অপ্রাকৃত বর্ণনা থেকে মুক্ত। অথচ ভারতচন্দ্র ও মঙ্গলকাব্যে অলৌকিক বর্ণনার প্রাচুর্য। দ্বিতীয়ত: "বৈষ্ণবদিগের কবিতা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা হইলেও তাহাদিগের গুণ এই যে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। মনুষ্য হৃদয়ের সঙ্গে মনুষ্য হৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়,—যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ নামে বিরক্ত তাঁহারা উক্ত নামদ্বয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন, কোন ক্ষতি হইবে না।"

১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র সংখ্যায় 'রায়বসন্ত' ও 'গোবিন্দদাস' শিরোনামে দুটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধে রায় বসন্ত প্রশস্তির পূর্বে এটাই সম্ভবত: বসন্ত রায় সম্পর্কে আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম আলোচনা। সমালোচকের মতে বিদ্যাপতির রচনায় যে গাম্ভীর্য ও প্রগাঢ়তা আছে রায় বসন্তের পদে তা নেই। এই প্রবন্ধটির প্রধান গুরুত্ব এই যে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত রায় প্রবন্ধের পূর্বে এটি রচিত। সুতরাং বসন্ত রায় রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার নয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই এই কবির পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়কে বিদ্যাপতির চেয়ে বেশী মূল্য দান করে অহেতুক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তুলনামূলকভাবে বিদ্যাপতির চেয়ে রায় বসন্তের শিল্প মূল্যের ন্যূনতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা যথার্থ বলে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্যাপতির রসঘন সংহত পদের তুলনায় রায় বসন্তের পদ ভাবের ক্ষেত্রে অনেক তরল এবং রচনা রীতিতে শিথিল ও অতিবিস্তারিত।

গোবিন্দদাস প্রবন্ধটি একই সঙ্গে গোবিন্দদাসের আলোচনা ও কাব্যবিচার। প্রথমে প্রাবন্ধিক ভূমিকায় বলেছেন যে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী একসময়ে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে; কিন্তু রুচির পরিবর্তনের ফলে বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে আধুনিক যুগে নতুন করে আগ্রহ

দেখা দিয়েছে। একথা বাস্তবিক যথার্থ। সমালোচনাটিতে কাব্যবিচার প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের পদে জয়দেবীয় ছন্দসঙ্গীত আলোচনা করে প্রাকচৈতন্যযুগের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মতোই চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গোবিন্দদাসকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১২৮২ সালের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষ 'গোবিন্দদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে কিন্তু প্রাকচৈতন্য যুগের কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনায় চৈতন্যোত্তর কবি গোবিন্দদাসকে নিম্নস্তরের প্রমাণ করে বলেছেন—"কবিত্বশক্তিতে সামান্য না হইলেও গোবিন্দদাস ও এযুগের কবিরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির চেয়ে অনেক নিম্নপর্যায়ের। এই সময়ের প্রায় তাবৎ কবির রচনার একটি প্রধান দোষ এই যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যেমন অন্তঃপ্রকৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন; ইঁহারা তাহা পারেন নাই। ইঁহাদের সকলই যেন বহিঃপ্রকৃতির বিষয়ীভূত। প্রেম যেন মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, উপর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।''

গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে প্রাকচৈতন্যযুগের কবিদের তুলনায় চৈতন্যোত্তর কবিদের সম্পর্কে এই সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত দেখলেই বোঝা যায় যে গতশতকের সমালোচনায় চৈতন্যপূর্ব কবিদের সম্পর্কে সমালোচকদের আত্যন্তিক পক্ষপাতের ফলে চৈতন্য পরবর্তী কবিগণ অনেকক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিচার পান নি। বিশেষতঃ জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তুলনায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস সম্পর্কে গতশতকের মূল্যবিচার যে আংশিকতাদুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। গতশতকের সমালোচনায় চৈতন্যোত্তর কালের পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান কবি ছাড়াও অন্যান্য অপ্রধান কবিরাও অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছেন। ১২৮৯ সালের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গের বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর কবিগণের জীবনী ও সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা আছে। এছাড়া ১২৯৯ সালের সাহিত্য পত্রিকায় ক্ষীরোদ রায় চৌধুরীর 'ঘনশ্যামদাস' ও 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', ১৩০০ সালের নব্যভারত পত্রিকায় হারাধন দত্তের 'বঙ্গের বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক গবেষণা, ১৩০৩ সালের নব্যভারতে অচ্যুত নারায়ণ রায়চোধুরীর 'বলরাম দাস' প্রবন্ধ, গতশতকের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর নরোত্তম ঠাকুর, ১৩০৫ সালে কালিদাস নাথের 'বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ', অচ্যুত চরণ চৌধুরীর 'স্ত্রীকবি মাধবী' ১৩০৬ সালে আনন্দনাথ রায়ের 'ঠাকুর নরহরি সরকার ও

রঘুনন্দন ঠাকুর' প্রভৃতি এই ধরণের বহু নিদর্শন আছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনাকে ঠিক সাহিত্য সমালোচনা বলা চলে না ; এগুলি পূর্বোক্ত বৈষ্ণব কবিদের কাব্যবিচার নয়, অনেকক্ষেত্রেই বরং কবিদের জীবনী ও কিংবদন্তীর উদ্ধৃতিপ্রধান আলোচনা। মাঝে মাঝে অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মন্তব্য লক্ষ করা যায়।

বর্তমান শতকেই চৈতন্য পরবর্তী কবিগণ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ যেমন এ যুগে চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছেন তেমনি তাঁকেই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর গোবিন্দ দাসকে মৈথিল কবিরূপে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা থেকে রক্ষা করার জন্য এযুগের অনেক গবেষক ও সমালোচক এগিয়ে এসেছেন এবং গোবিন্দদাসের কবিপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ১৩১১ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি শীর্ষক প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ১৩১৭ সালের নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বসু গোবিন্দদাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গোবিন্দদাস সম্পর্কে বহুসংখ্যক আলোচনা করেন সতীশচন্দ্র রায়। ১৩১৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ' প্রবন্ধমালায় সতীশচন্দ্র রায় গোবিন্দদাসের কাব্যরীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া ১৩১৮ সালের প্রাচী পত্রিকায়, ১৩৩২ সালের সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকায় এবং ১৩৩৩ সালের কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকায় ও ১৩৩৩ সালের ভারতী পত্রিকায় সতীশচন্দ্র গোবিন্দদাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবিরূপে প্রমাণ করে যে প্রবন্ধ রচনা করেন, ১৩৩৬ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সুকুমার সেন তার প্রতিবাদে গোবিন্দদাসের কবিপরিচয় নির্ধারণ প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে শঙ্করীপ্রসাদ বসু মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থের (১৩৬২) 'গোবিন্দদাস' প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের কাব্যের চমৎকার আলোচনা করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' নামক সঙ্কলন গ্রন্থের (১৩৬৮) ভূমিকা ও পরিশিষ্টে এই সমস্ত আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ্য করা যায়।

উল্লিখিত সমালোচনাগুলিতে প্রত্যেক সমালোচকই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত গোবিন্দদাসের কবিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন :

"যেন চরাচরের জন্য বৈকুণ্ঠের অমৃত ও সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া গেছে।... ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং ভাবের গভীরতায় গোবিন্দদাস তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী সমস্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" সমালোচক গোবিন্দদাসের সুন্দর সুন্দর শব্দসমুচ্চয়ের তালিকা দিয়ে বলেছেন—"তাঁহার শব্দবৈভবের সীমা ছিল না। তিনি অনেকগুলি পদ একটি আদ্য অক্ষরের কথা দিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন অথচ তাহাতে ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনায় গোবিন্দদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব স্বীকার করলেও সমালোচক বিদ্যাপতি অপেক্ষা গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে বলেছেন—"এমন সংযত প্রেমের চিত্র বিদ্যাপতির কাব্যে দুর্লভ।"

জিতেন্দ্রলাল বসু গোবিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ অলঙ্কারের মাধুর্য বিশ্লেষণ করে গোবিন্দদাসের উপর জয়দেবের প্রভাব আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনা করে বিদ্যাপতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে সমালোচক বলেছেন - "শিষ্য গুরুর গাম্ভীর্য ভাল রকম ধরিতে পারেন নাই।"

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে প্রেমের তিনটি স্তর আলোচনা করে সমালোচক গোবিন্দদাসের প্রেমচেতনার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক গোবিন্দদাসের রচনারীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে দুটি প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—১) অনুপ্রাসের সুব্যবহার, (২) যুক্তাক্ষরের সমীচীন প্রয়োগ। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে শিল্পী কবি হিসাবে গোবিন্দদাসের সাদৃশ্য ও কবিত্বের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সতীশচন্দ্র রায়ের গোবিন্দদাস কবিরাজ শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি মূলত গোবিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের আলোচনা। ভূমিকায় গোবিন্দদাসের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রাপ্ত জীবন-তথ্য থেকে গোবিন্দদাসের চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতি-প্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করে সমালোচক বলেছেন—"গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত সাহিত্যে নিতান্ত পারদর্শিতা ও প্রৌঢ় বয়সে পদরচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কারণ বটে।" গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতি-অনুকৃতি সত্ত্বেও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের

তুলনায় তাঁর মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রসঙ্গে সমালোচক গোবিন্দদাসের ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে সংস্কৃত রসতত্ত্বের আদর্শানুযায়ী গোবিন্দদাসের পদাবলীর হাস্যরস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উপসংহারে পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাসের স্থান নির্ণয় করে বলেছেন—"তাঁহার (গোবিন্দদাসের) অপেক্ষা জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, প্রভৃতি কোন কোন কবির বাংলা পদরচনা অনেকস্থলেই উৎকৃষ্টতর এবং কোন কোন রসচিত্র কোনস্থলে উজ্জ্বলতর হইয়া থাকিলেও আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না।" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সুকুমার সেনের গোবিন্দদাস কবিরাজ শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রথমাংশ মূলতঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গোবিন্দদাসকে মৈথিলী প্রমাণ করার অপচেষ্টার তথ্যপূর্ণ প্রতিবাদ। গোবিন্দদাসের তথ্যপূর্ণ জীবনী আলোচনা করে সুকুমার সেন গোবিন্দদাসকে বাঙ্গালী কবিরূপেই প্রতিপন্ন করেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে প্রাকচৈতন্যযুগের পদাবলীর সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়ে সমালোচক বলেছেন—"বৈষ্ণব সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবির সংখ্যা প্রচুর। প্রধান প্রধান কবিদিগের নাম বলিতে গেলে বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম ঠাকুর, যদুনন্দন দাস, নরহরি দাস (ঘনশ্যাম) ইত্যাদি। এই সকল প্রথম শ্রেণীর কবির মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের স্থান সর্বোচ্চে।" অতঃপর গোবিন্দদাস কবিরাজের লীলাপর্যায় সম্পর্কে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় আলঙ্কারিক কবিরূপে গোবিন্দদাস কবিরাজকে সমালোচক প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্তমান শতকে আধুনিক দৃষ্টির আলোকে জ্ঞানদাসের নতুন করে মূল্যবিচার করা হয়েছে। গত শতকে জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের কবিতাকে নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করে যে অবিচার করা হয়েছিল, এই শতকে তা সংশোধন করা হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জ্ঞানদাসের বিষয়ে কয়েকটি দীর্ঘ আলোচনা চোখে পড়ে। ১৩১৯ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বসু 'বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস,' শিরোনামে জ্ঞানদাসের বিস্তৃত কাব্য বিচার করেছেন। ১৩৩২ সালের সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকায় সতীশচন্দ্র রায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধটি রমণীমোহন সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ বিচার। সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকায় ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সতীশচন্দ্র রায়ের 'জ্ঞান দাসের পদাবলীর রসাস্বাদন' প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভা সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৬২) গ্রন্থে 'জ্ঞানদাস' প্রবন্ধটি এই আলোচনা ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' (১৩৭২) সংকলনের ভূমিকাটি জ্ঞানদাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও সমালোচনা।

জিতেন্দ্রলাল বসুর 'বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস' শীর্ষক আলোচনায় সমালোচক বৈষ্ণব সাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"বৈষ্ণব সাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান বিশেষ উন্নত। এমন কি বিষয়ের বহুত্বকে যদি স্থান নির্ণয়ের অধিকারী বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাঁহার স্থান দুই একজনের নীচে হইতে পারে, এতদধিক নিম্নে যাইবে না।"

প্রাবন্ধিকের মতে জ্ঞানদাসের পদে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমন্বয় হয়েছে। দানলীলা ও নৌকালীলার পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে সমালোচক জ্ঞানদাসের পদের অর্থব্যঞ্জনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানদাসের রাধাচরিত্রের বিবর্তন আলোচনা করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানদাসের রাধা প্রথমদিকে আমিত্বময়ী কিন্তু পরিণামে আমিত্ববর্জিত ও সর্ব সমর্পিত, বিরহের দহনে অহং বর্জিত। গোবিন্দদাসের পদে নেই এমন কিছু কিছু বিষয় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে সমালোচক আলোচনা করেছেন। সর্বশেষে জ্ঞানদাসের পদাবলীর রুচি বিশুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সতীশচন্দ্র রায় জ্ঞানদাস সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কেবল কাব্যপ্রশংসা নেই, জ্ঞানদাসকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা আছে। সতীশচন্দ্রই প্রথম আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিরূপে জ্ঞানদাসকে নবজন্ম দান করেন। আধুনিক বিচারে জ্ঞানদাস সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ দেখা দিয়েছে পদকল্পতরুর ভূমিকায়—"জ্ঞানদাসের কোন কোন ব্রজবুলির পদে তাঁহার

পাণ্ডিত্য ও রচনা পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহার অধিকাংশ ব্রজবুলির পদ বিশেষতঃ বাংলা পদগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ও আবেগময় যে সেগুলি পাঠমাত্রেই সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া ফেলে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগের চমৎকারিত্ব বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন করে না। ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান নব্য কবিতার (Romantic Poetry) ইহাই প্রধান লক্ষণ। জ্ঞানদাসের কবিতা বেশীর ভাগই এরূপ লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভাবোচ্ছ্বাসপ্রধান নব্যকবিতার ভক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে।" রোমান্টিক কবিরূপে জ্ঞানদাসের আধুনিক সমাদর বিস্তৃতভাবে দেখা দিয়েছে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখের জ্ঞানদাস সম্পর্কিত আলোচনাগুলিতে।

সতীশচন্দ্র রায় অবশ্য জ্ঞানদাসকে সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করেন নি। বৈষ্ণব সাহিত্য জ্ঞানদাসের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রলাল বসুর মতোই সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন—"আমরা বর্ণিত অপূর্বতার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের সহিত জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলিকে পদাবলী সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও মোটের উপর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসকে অধিক শক্তিশালী কবি বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারি নাই। তাঁহাদিগের পদাবলী আমাদিগের অনভ্যস্ত ভাষায় রচিত বলিয়া তেমন আবেগপূর্ণ মনে না হইলেও তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের রচনায় নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও শ্লেষ, রূপক ও সমাসোক্তি ইত্যাদি দুরূহ অলঙ্কার ও সুখবোধ্য রসধ্বনির অপেক্ষাও সুপণ্ডিত ও সুরসিকমাত্রবেদ্য অলঙ্কারধ্বনি ও বস্তুধ্বনির প্রাচুর্যহেতু অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুরূহ হইলেও, বিদ্যাপতি বিশেষতঃ গোবিন্দদাস অনেক পদে কবিতার প্রাণরসের উৎকর্ষকে অব্যাহত রাখিয়া কাব্যালঙ্কার, অলঙ্কারধ্বনি ও বস্তুধ্বনির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় জ্ঞানদাস সরল স্বাভাবিক ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাংলা পদ রচনায় গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান গোবিন্দদাসের পরেই নির্দেশ করা সঙ্গত।"

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যদিও এ যুগের প্রধান সমালোচ্য কবি কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের নিয়েও এ যুগে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। ১৩১১-১২ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্তের 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পাশাপাশি লোচনদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরঞ্জন, গোপালদাস, আত্মারাম দাস ও নৃসিংহানন্দ প্রমুখ পদকর্তাদের নিয়েও আলোচনা আছে। চৈতন্যসমসাময়িক কবিদের মধ্যে নরহরি সরকার সম্পর্কে শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্তের আলোচনা আছে ১৩১১সালের প্রদীপ পত্রিকায়; রায় রামানন্দ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন মনোরঞ্জন গুহ ১৩০৮ সালের প্রদীপ পত্রিকায়।

শৌরেন্দ্রমোহন 'লোচনদাস' প্রবন্ধের প্রথমাংশে লোচনদাসের জীবনী ও কিংবদন্তী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অংশে চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক লোচনদাসের চণ্ডীদাসধর্মী কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন—'সকল পদগুলিতেই লোচনদাসের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সকলগুলির ভিতরেই এমন একটা সরলতা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের ভাষা উপভোগ করা যায়—যাহা চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব কবির কাব্যে দুর্লভ।' সমালোচনাটিতে ব্যক্তিগত আবেগ ও উচ্ছ্বাস অনেক বেশী, যুক্তি বিচার তুলনায় কম। এ ছাড়া এক জায়গায় একটু ত্রুটি আছে। জ্ঞানদাসের বিখ্যাত 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' পদটি লোচনদাসের 'গৌরাঙ্গের রূপ' বলে উদ্ধৃত করে সমালোচক অহেতুক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সমালোচনাটি আবেগধর্মী হলেও লোচনদাস সম্পর্কে আস্বাদনপন্থী আলোচনা।

বলরাম দাস প্রবন্ধটিতে সমালোচক ১১ জন বলরাম দাসের সন্ধান দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে দুজনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন—(১) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ শিষ্য বলরাম দাস। (২) চৈতন্যোত্তরযুগের শ্রীখণ্ড নিবাসী জাহ্নবা-শিষ্য প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচয়িতা বলরাম দাস। বলরামের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করে তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন :

'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের পরেই বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তাগণের

মধ্যে বলরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর মত বলরাম দাসেরও কবিতা কবি হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাবধারা।

চণ্ডীদাসের মত তাহাতে ভাবের গভীরতা নাই সত্য এবং বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিতাসুলভ অসাধারণ শাব্দিকতা, ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার, চরিত্র চিত্রণের সুন্দর বর্ণচ্ছটা বিরল বটে, কিন্তু তথাপি তাহার সরল বর্ণনা মধুর ভাবাবেগ, প্রেম ও আবেগের ভাবোচ্ছ্বাস হৃদয় হরণ করে।'

বাৎসল্য রসে বলরাম দাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন তা যথার্থ। বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থের বলরাম দাস প্রবন্ধে বলরাম দাসের এই দিকটা অত্যন্ত নিপুণ সার্থকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'রায়শেখর' প্রবন্ধটিতে সমালোচক রায়শেখরের জীবনী আলোচনা করে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর থেকে রায়শেখরের ভিন্নতা দেখিয়েছেন এবং কবিশেখর ও রায়শেখরের অভিন্নতা প্রমাণ করে কবিশেখর বা রায়শেখর যে বিদ্যাপতি নন তার প্রমাণ দিয়েছেন। এরপর রায়শেখরের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন :

'রায়শেখরের পদাবলীতে অপূর্ব ছন্দের ঝঙ্কার কিম্বা ভাবের তেমন প্রগাঢ়তা অনুভূত হয় না, কিন্তু অতি সহজ কথায়, প্রেমক্ষরিত ভাবধারা নির্ঝরিণীর মতো হৃদয়ের কূলে কূলে বহিয়া যায়। ভাবের প্রচণ্ড আবেগ, বাসনার তীব্র ঘূর্ণন, হৃদয়কে আন্দোলিত, বিধ্বস্ত করে না, কিন্তু ফুলবনে মলয় সমীরণের মত তাহা ধীরে স্পর্শ করে। চণ্ডীদাসের ভাবের গভীরতা, বিদ্যাপতির অতৃপ্তি ও বাসনার ব্যাকুল উচ্ছ্বাস, গোবিন্দদাসের ভক্তি ও প্রেমবিহ্বল হৃদয়খানি রায়শেখরের পদাবলীতে ফুটিয়া ওঠে নাই বটে, কিন্তু তথাপি রায়শেখরের পদাবলীতেও হৃদয়ের প্রতিভাব, মিলনবিরহের প্রতিচিত্র, মান অভিমানের সকরুণ গাথা অতি সহজে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' রায়শেখরের এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও হৃদয়গ্রাহী। রায়শেখরের মর্মগ্রাহী আলোচনা পরবর্তীকালে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে।

'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় পূর্বোক্ত অন্যান্য কবিদের জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা আছে। কবিরঞ্জন সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—"মাধুর্য, সরসতা ও কল্পনার বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে, ছন্দের অপূর্ব ধ্বনি ও

ঝঙ্কারে তাঁহার ছোট বিদ্যাপতি আখ্যা অনেকসময় সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—"তাঁহার এক একটি ভাবের কবিতা অবহেলে মনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে, অথচ কখন তাহা মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল তাহা সম্যক বোঝা যায় না, এক একটি ছত্রের রূপকাংশে তেমন কবিত্ব বুঝা যায় না, কিন্তু সমস্তটা মিলিয়া মনের মধ্যে একটা ভাবের চিত্র আঁকিয়া যায়। চন্দ্রশেখরের পদাবলীতে পূর্বোক্ত কবিদিগের মত ছন্দের ঝঙ্কার, শব্দচাতুর্য নাই, তবে স্থানে স্থানে অনুপ্রাসে রস উথলিয়া উঠিয়াছে।'

আত্মারাম দাস সম্পর্কে আছে—"পদগুলি বেশ সদ্ভাবপূর্ণ। বর্ণনাশক্তি ও কবিত্ব স্থানে স্থানে বেশ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পদাবলীগুলি ভক্ত-হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দেবতার পদে উৎসর্গীকৃত।" নৃসিংহানন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"কবির ভাষা ও শব্দের উপর বেশ প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্থানে স্থানে পদাবলী এক অক্ষরের সাজেই সুখ্যাত রচনা করিয়াছেন, কোথাও পদাবলীর প্রতিপদের প্রথম শব্দগুলির আদ্য অক্ষর এক, অথচ তাহার জন্য পদাবলীর মাধুর্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।"

চৈতন্যোত্তর যুগের যে তিনজন কবির কবিত্ব সম্পর্কে এযুগে বিশেষ বিতর্ক তাঁরা তিনজনই অষ্টাদশ শতকের,—জগদানন্দ রায়, নরহরি চক্রবর্তী এবং রাধামোহন ঠাকুর। এঁদের সম্পর্কে একই সঙ্গে প্রচুর নিন্দা ও প্রশংসা দুইই লক্ষ করা যায়।

১৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ' প্রবন্ধে কালিদাস নাথ চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর দুজন জগদানন্দের পরিচয় দিয়ে চৈতন্যোত্তর জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ, এই চতুর্বিধ পদাবলীর দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করেছেন। জগদানন্দের পদাবলীর ভূমিকায় কালিদাস নাথ জগদানন্দের প্রচুর প্রশংসা করে বলেছেন:

"এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলদুর্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্যসমালোচক পণ্ডিত মাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুর শক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্যচিত্র পদাবলীপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা

গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপটের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর।...কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্য, কি শব্দবিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্বতন ও পরবর্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য।

জগদ্বন্ধু ভদ্র কালিদাস নাথকে সমর্থন করে বলেছেন "কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য ব্যপদেশে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাই এ বিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা।" সতীশচন্দ্র রায় কিন্তু জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বলে মনে করেন। জগদানন্দ সম্পর্কে পূর্ববর্তী সমালোচকের মন্তব্য সম্পর্কে পদকল্পতরুর ভূমিকায় বলেছেন—"কালিদাস নাথ ও জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়দিগের ন্যায় দুইজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবীন ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া জগদানন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকর্তার সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদিগের নিকট একান্ত বিস্ময়জনক বোধ হয়।"

জগদানন্দের অনুপ্রাস ও পদলালিত্য সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় যে প্রশংসা করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন সেটুকু প্রশংসা করতেও নারাজ। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' জগদানন্দের তীব্র সমালোচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—"যাঁহারা শুধু ললিত শব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।" সতীশচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের এই চরম বিরোধিতার প্রতিবাদ করেছেন; তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন—"জগদানন্দের পদের অনুপ্রাস ও পদলালিত্য বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া তিনি যে অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলি সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। অনুপ্রাস ও পদলালিত্যের অসাধারণ উৎকর্ষ থাকা সত্বেও তাঁহার প্রায় সকল পদেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার উপযোগী উপমা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের এবং ক্বচিৎ কোন পদ প্রথম শ্রেণীর কবিতার উপযোগী ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য দেখা যায়। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ঘনশ্যাম কবিরাজ প্রভৃতির সমশ্রেণীতে স্থান দিলে অসঙ্গত হইবে না, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।"

ঘনশ্যাম দাস বা নরহরি চক্রবর্তীও এযুগে একজন বিতর্ক স্থানীয় কবি। দীনেশচন্দ্র সেন নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরের প্রশংসা করলেও পদাবলী সম্বন্ধে

বিশেষ কিছু বলেন নি। কেবল নরহরির গৌরচরিতচিন্তামণি থেকে একটি বাংলা পদ উদ্ধৃত করে ভাষার লালিত্য ও বর্ণনামাধুর্যের প্রশংসা করেছেন।

১২৯১ সালের সাহিত্য পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'ঘনশ্যাম দাস' প্রবন্ধে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছেন—"নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাঁহার রচনায় মানবচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।"

জগদ্বন্ধু ভদ্র ক্ষীরোদবাবুর এই মন্তব্যের সমালোচনা করে ঘনশ্যাম দাস সম্পর্কে লিখেছেন—"প্রাচীন বাঙ্গলা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন. তবে গোবিন্দদাস কোন শ্রেণীর কবি? তাঁহারা যদি প্রথম শ্রেণীর কবি হয়েন তবে ঘনশ্যামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে, অর্থাৎ তুল্য বা শ্রেষ্ঠ, তখন জ্যামিতির সূত্র অনুসারে ঘনশ্যামও প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর যদি তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়া অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট।"

'তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে'—ক্ষীরোদবাবুর এই মতের প্রতিবাদ করে জগদ্বন্ধু ভদ্র নরহরি চক্রবর্তীর মূল্য বিচার করে লিখেছেন:

"আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায় যাইবার যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তবে ঘনশ্যামের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি দেশকাল ও পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশস্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। অপিচ ঘনশ্যামের

প্রধান দোষ এই যে, ইহার পদগুলি সর্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে। অনেকস্থানে বড় খটমট লাগে।"

সতীশচন্দ্র রায় পূর্বের মতো এক্ষেত্রেও মধ্যপন্থী। ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বন্ধুর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করে নরহরি চক্রবর্তী সম্পর্কে মাঝামাঝি একটা মতপ্রকাশ করে বলেছেন—"আমরা ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়েরই উক্তি সত্য ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরই যে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের স্থান তাহাতে মতভেদ নাই। এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি, কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম কবি বলা হইবে, তাহা লইয়া কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্তীর শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক বিশেষত: নদীয়া নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর পদগুলির মতো একটা যে অনন্যসাধারণ ও অপূর্ব নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা আছে তাহা রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। '(নরহরি) দেশকাল পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন।'—জগদ্বন্ধুবাবুর এই উক্তির দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষীরোদবাবুর স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত 'নরচরিত্রের স্বাভাবিকতাই' স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহরি চক্রবর্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেষ্ঠ কবিতাসুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়, উহা লইয়াই কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার আবশ্যক। জগদ্বন্ধুবাবু যে বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু মূল্য—ঐতিহাসিক হিসাবে। সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। রাধামোহনের সংস্কৃত ব্রজবুলি ও বাংলা রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। বাসুদেব ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগদ্বন্ধুবাবুর উল্লিখিত শুধু রায়শেখর, লোচনদাস ও বলরাম দাস নহে,—অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন বসুরামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। ইহাদিগের সকলেরই অল্পাধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিকল্পনার (Imagination) বিচিত্র লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অনুধাবন (Keen observation) কবিকল্পনার অল্পতা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য

বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরহরি চক্রবর্তীরও উচ্চ অঙ্গের কবিকল্পনার পরিবর্তে লোকচরিত্রজ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তাই তিনি প্রায় সর্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"

এরপর সতীশচন্দ্র ঘনশ্যাম দাস তথা নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের কবিত্বের তুলনা করে বলেছেন :

"নরহরি - ঘনশ্যাম ও ঘনশ্যাম কবিরাজ উভয়েই প্রায় একসময়ের পদকর্তা ও পদরচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া ঘনশ্যাম ভণিতায় পদাবলী হইতে উভয়ের পদ বাছিয়া পৃথক করা তত সহজ নহে। তবে ঘনশ্যাম কবিরাজ তাঁহার পদে বিশেষত: ব্রজবুলি পদে, তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাসঝঙ্কার ও অলঙ্কারপ্রাচুর্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর ব্রজবুলির পদে দুর্লভ।"

রাধামোহন ঠাকুর সম্পর্কেও আধুনিক যুগে সপক্ষবাদী ও বিপক্ষবাদী মতবাদ লক্ষ করা যায়। জগবন্ধু ভদ্রের মতে রাধামোহন ঠাকুর উচ্চশ্রেণীর কবি। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগবন্ধু ভদ্র রাধামোহন ঠাকুরের রচনার প্রশংসা করে বলেছেন—"ইঁহার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অনুকরণে লিখিত।"

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় রাধামোহনের রচনার প্রশংসা করতে পারেন নি। জগবন্ধু ভদ্রের প্রতিবাদ করে সতীশচন্দ্র রাধামোহনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"রাধামোহনের কবিত্ব সম্বন্ধে জগবন্ধু বাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত। তাঁহার পদাবলীতে রসশাস্ত্রের নিয়ম রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক কবিত্বের উদাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধহয় অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও রসশাস্ত্রানুবর্তিতাই স্বাভাবিক কবিত্ব বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাঁহার পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে তিনি স্পষ্টত: বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানে পূর্বতন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের পদ পান নাই, সেখানে অগত্যা তাঁহাকে পদরচনা করিয়া পালা পূরণ করিতে হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, ফরমায়েসী কবিতার ন্যায় এরূপ দায়ে পড়িয়া পদরচনা করিলে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতে পারে না। এজন্য আমরা রাধামোহন ঠাকুরকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চস্থান

দিলেও কবি হিসাবে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে অক্ষম। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।"

মৃণালকান্তি ঘোষ এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জগদ্বন্ধু ও সতীশচন্দ্রের মতবাদের সামঞ্জস্য সাধন করে বলেছেন—"রাধামোহন ঠাকুরের কবিত্ব সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর উক্তি কতটা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সতীশবাবু অপরদিকে তাঁহাকে নামাইয়া যেস্থানে আনিতে চাহেন তাহাও ঠিক নহে।"

বাংলাদেশে রাধাবাদকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে রাধামোহন ছিলেন সে যুগে স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মোহান্ত। মহাভাবানুসারিণী টীকা রচনার ক্ষেত্রে টীকাকার হিসাবে তিনি অসামান্য বৈষ্ণব রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পদামৃত-সমুদ্র সংকলনে রাধামোহনের সংকলন-কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু কবিত্বশক্তিতে রাধামোহনের প্রতিভা খুব উচ্চস্তরের নয়। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবপদরচনার ক্ষেত্রে যে কৃত্রিমতা ও শিক্ষিতপটুতা দেখা দিয়েছিল উল্লিখিত তিনজন কবির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাধামোহনের মধ্যে এই লক্ষণ আবার সর্বাধিক। পদসংকলনে স্থানপূরণের জন্যে তিনি যে সমস্ত স্বরচিত পদ সংযোজিত করেছেন সেগুলি আন্তরিকতাহীন, রীতিসর্বস্ব ও মৌলিকতাবর্জিত। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—"রাধামোহনের পদাবলী বৈশিষ্ট্যবর্জিত, গোবিন্দদাস কবিরাজের দুর্বল ছাঁকা অনুকরণ।"

উপসংহার

ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত আধুনিক কালে যাঁরা বৈষ্ণব কবিদের শ্রেষ্ঠ সমালোচক তাঁরা প্রায় কেউই ধর্মমতে বৈষ্ণব নন। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণব কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব না হলেও শ্রেষ্ঠ সমালোচক হওয়া যায়। বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ নিয়ে বৈষ্ণব কাব্যের সমালোচনা করতে গেলেই বরং অনেক সময় নিরপেক্ষ বিচার করা যে যায় না তার প্রমাণ গত শতকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উচ্ছ্বাসসর্বস্ব পদপ্রশংসাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব পত্রিকায় গত শতক থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা প্রচুর পরিমাণে হলেও অধিকাংশ রচনা ভক্তিভাবাবেগে এলায়িত। বিশেষতঃ সমালোচক যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে সেক্ষেত্রে কাব্য-বিশ্লেষণের পরিবর্তে ভক্তিরসাস্বাদনই মুখ্য হয়ে ওঠে। বরং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে যাঁরা বৈষ্ণব কাব্য সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভক্তিবিহ্বলতার পরিবর্তে বিচারশীল সাহিত্যজিজ্ঞাসা মুখ্য হয়ে ওঠায় এধরণের সমালোচনায় এঁদের কৃতিত্ব অনেক বেশী। এই কারণে গত শতকের ও বর্তমান শতকের ভালো ভালো বৈষ্ণব কবিসম্পর্কিত আলোচনাগুলি বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিতেই স্থান লাভ করেছে। বস্তুত 'বৈষ্ণব' বা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' জাতীয় বৈষ্ণব পত্রিকাগুলি নয়, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিই বৈষ্ণব কাব্যসমালোচনার যথার্থ পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, প্রদীপ, নারায়ণ, প্রবাসী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা-গুলি এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে উৎকৃষ্ট সমালোচনার কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক আলোচনার জন্যই পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, হারাধন দত্ত, অচ্যুতনারায়ণ রায় চৌধুরী, বসন্তরঞ্জন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন বসু, বিমান

বিহারী মজুমদার, সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ বৈষ্ণব রসজ্ঞ হলেও মূলতঃ গবেষকধর্মী সমালোচক। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রেই পূর্বোক্তদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কালিদাস রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবীয় ভাবাবেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বৈষ্ণব সাহিত্য, কালিদাস রায়ের পদাবলী সাহিত্য এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পদাবলী পরিচয় গ্রন্থান্তর্গত রচনাগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল্যবান আলোচনা সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবাবেগময় ও তত্ত্বাশ্রিত বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের এই আলোচনাগুলিতে তত্ত্বব্যাখ্যা ও রসভাষ্য যতখানি পাওয়া যায়, আধুনিক বিচার বিশ্লেষণ সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে রসবিচারমূলক আধুনিক সমালোচনা দেখা দিয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অজিত কুমার চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বসু, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ সমালোচকদের হাতে। এঁদের মধ্যে যদিও সকলের কৃতিত্ব সমমূল্যের নয়, কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী হল বৈষ্ণব কবিদের বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ আধুনিক সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে নতুন করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্যযুগের কবি ও কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে শেষোক্ত সমালোচকদের নাম তাই একই সঙ্গে স্মরণযোগ্য এবং পরবর্তী সংকলন মূলতঃ শেষোক্ত সমালোচকদেরই সংকলন। অবশ্য প্রয়োজন মতো পূর্বোক্ত সমালোচকদের রচনাও অন্তর্ভুক্ত হল।

বর্ণানুক্রমিক পত্রিকাতালিকায় প্রবন্ধ ও লেখকসূচী

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
আর্যদর্শন	১২৮১	বিদ্যাপতি	
উদ্বোধন	১৩১৬	মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল	জিতেন্দ্রলাল বসু
	,,	বাৎসল্যরস ও বৈষ্ণব কবিকুল	জিতেন্দ্রলাল বসু
	,,	সখ্যরস ও বৈষ্ণব কবিকুল	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩১৭	মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩১৮	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	জিতেন্দ্রলাল বসু
উপাসনা	১৩২২	বিদ্যাপতির ভাষা	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩৩৫-৩৬	জয়দেবকাব্যে ভোগবাদ	বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
	১৩৩৭	গীতগোবিন্দ	মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
	১৩৩৮	চণ্ডীদাস রজকিনী	পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
জ্ঞানাঙ্কুর	১২৮১	রায় বসন্ত	
	,,	চণ্ডীদাস	
	,,	গোবিন্দদাস	
নবজীবন	১২৯১-৯২	বৈষ্ণব কবির গান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১২৯৩-৯৪	জয়দেব	অক্ষয় চন্দ্র সরকার
নব্যভারত	১২৯৯	গোবিন্দদাস কবিরাজ	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী
	১৩০০	চণ্ডীদাস	ঐ
	১৩০০	বঙ্গের বৈষ্ণব কবি	হারাধন দত্ত
	১৩০১	বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস	ঐ
	১৩০১	বিদ্যাপতি	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী
	১৩০৩	বলরাম দাস	অচ্যুতনারায়ণ রায়চৌধুরী
	১৩২০	জয়দেব	নীলরতন মুখোপাধ্যায়

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
নারায়ণ	১৩২২	বৈষ্ণব কবিতার কথা	বিপিনচন্দ্র পাল
	১৩২৩	বাংলার গীতিকবিতা	চিত্তরঞ্জন দাস
	,,	বৈষ্ণব মহাজন ও বাংলা মহাজনপদ	বিপিনচন্দ্র পাল
	১৩২৪	বৈষ্ণব কবিতা	সতীশচন্দ্র রায়
প্রদীপ	১৩০৮	রায় রামানন্দ	মনোরঞ্জন গুহ
	১৩১১-১২	শ্রীখণ্ডের প্রাচীনকবি	শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত
প্রবাসী	১৩২৩	বৈষ্ণব কবিতা	অজিত কুমার চক্রবর্তী
	১৩৩৪	চণ্ডীদাস	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৩৬	চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ	মণীন্দ্রমোহন বসু
	১৩৩৬	বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
	১৩৩৯	বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	১৩৪৯	বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৩৬০	পদাবলী সাহিত্যে রায়বসন্ত	পূর্ণেন্দু গুহ রায়
বঙ্গদর্শন	১২৮০	জ্ঞানদাস	
	১২৮০	বলরাম দাস	
	১২৮১	কৃষ্ণচরিত্র	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	১২৮২	বিদ্যাপতি	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)	১৩১৪	লোচন দাস	শৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত
	১৩১৭	গোবিন্দ দাস	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩১৯	জয়দেব ও বিদ্যাপতি	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩১৯	জ্ঞানদাস	জিতেন্দ্রলাল বসু

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
বঙ্গভাষা	১৩১৪	গোবিন্দদাস	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
		বিদ্যাপতির পদসঙ্কলন	ঐ
		বিদ্যাপতির পদাবলী	ঐ
বঙ্গশ্রী	১৩৪৮	গোবিন্দদাস	কালিদাস রায়
বান্ধব	১২৮২	গোবিন্দদাস	কৈলাশচন্দ্র ঘোষ
বিচিত্রা	১৩৩৭-৩৮	গীতিকবিতায় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস	সুধীর রঞ্জন ঘোষ
বিবিধার্থ সংগ্রহ	১২৬৫	বঙ্গভাষার উৎপত্তি	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
বিশ্বভারতী	১৩৫০	চণ্ডীদাস সমস্যা	সুখময় চট্টোপাধ্যায়
	১৩৫৩	বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ	সুকুমার সেন
	১৩৫৯	কবি বিদ্যাপতি	তারাপদ মুখোপাধ্যায়
	১৩৬১	বাংলার মুসলমান কবি	শশিভূষণ দাসগুপ্ত
ভারতী	১২৮৮	বসন্ত রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ঐ	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	ঐ
	১২৮৯	চণ্ডীদাস, বসন্তরায়, বিদ্যাপতি	কৈলাসচন্দ্র সিংহ
ভারতী ও বালক	১২৯৬	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১২৯৭	জয়দেব	প্রমথ চৌধুরী
ভারতী	১৩০২	চণ্ডীদাসের কবিত্বাস্বাদন	উমেশচন্দ্র বটব্যাল
	১৩১১	গোবিন্দদাস	দীনেশচন্দ্র সেন
	১৩১১	চণ্ডীদাস	ঐ
ভারতবর্ষ	১৩২২-২৩	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	মহেন্দ্রচন্দ্রদেববর্ম বিদ্যার্ণব
	১৩২৩	বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী	আবদুল করিম
	১৩২৪-২৫	গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বৃত্তানুপ্রাস	গণেশচন্দ্র শীল

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
ভারতবর্ষ	১৩৩৩	বিশ্বমানসে বৈষ্ণবকাব্য	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	১৩৩৬	বাঙ্গালী কবিরাজ গোবিন্দদাস	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৩৬	বাঙ্গালী কবি বিদ্যাপতি	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৪১	পদকর্তা বলরাম দাস	ঐ
	১৩৪৪	কবিবল্লভ	ঐ
	১৩৪৮	গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার অভিসার	শুভব্রত চৌধুরী
	১৩৪৭	পদকর্তা নয়নানন্দ	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৪৮	জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা	পূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়
	১৩৪৮	বৈষ্ণব কবিতা	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৪৮	পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ	ঐ
	১৩৪৯	বিদ্যাপতির শ্রীরাধা	শুভব্রত রায়চৌধুরী
	১৩৫০	শ্রীজয়দেব কবি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
	১৩৫২	বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
	১৩৫৬	বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
মানসী	১৩১৭	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	দয়ালচন্দ্র ঘোষ
মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৪	বিদ্যাপতি-সূক্ত	জিতেন্দ্রলাল বসু
	১৩২৯-৩০	বিদ্যাপতির কাব্য	রাজেন্দ্রলাল আচার্য
	১৩৩১-৩২	জয়দেব	সুরেশচন্দ্র ঘটক
	১৩৩৫-৩৬	বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য	শিবরতন মিত্র
রেনেসাঁ	১৩৬৮	জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা	বিমানবিহারী মজুমদার
সবুজপত্র	১৩২৪	বিদ্যাপতি	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
সাধনা	১২৯৯	বিদ্যাপতির রাধিকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	"	গোবিন্দদাস	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
	১৩০০	জয়দেব	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
সাহিত্য	১২৯৯	ঘনশ্যাম দাস	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী
	"	মুসলমান বৈষ্ণব কবি	ঐ
	১৩০২	বিদ্যাপতি	ঐ
	১৩০৭	নরোত্তমের রাধিকার মানভঞ্জন	আবদুল করিম
	১৩০৮	চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন	ঐ
	"	বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্তি	ঐ
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	১৩০৪	নরোত্তম ঠাকুর	অচ্যুত চরণ চৌধুরী
	১৩০৫	স্ত্রীকবি মাধবী	ঐ
	"	বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ	কালিদাস নাথ
	১৩০৬	ঠাকুর নরহরি সরকার ও নরোত্তম ঠাকুর	আনন্দনাথ রায়
	১৩১২	বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস	ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত
	১৩১৬-২০	প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ	সতীশচন্দ্র রায়
	১৩২০	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বসন্তরঞ্জন রায়
	১৩২২	জ্ঞানদাসের পদাবলী	সতীশচন্দ্র রায়
	১৩২৫	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	ঐ
	১৩২৬	চণ্ডীদাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	১৩২৭	বৈষ্ণব পদাবলী	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	১৩২৯	চণ্ডীদাস	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
	১৩৩৩	দীন চণ্ডীদাস	মণীন্দ্রমোহন বসু
	১৩৩৪	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	রমেশ বসু
	১৩৩৫	কবিরাজ গোবিন্দদাস	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পত্রিকার নাম	সাল (বঙ্গাব্দ)	প্রবন্ধ	লেখক
সাহিত্য পরিষৎ	১৩৩৬	গোবিন্দদাস কবিরাজ	সুকুমার সেন
পত্রিকা	১৩৩৭	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	১৩৪০	চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন	জনার্দন চক্রবর্তী
	"	শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস	সুকুমার সেন
	১৩৪২	চণ্ডীদাস	যোগেশচন্দ্র রায়
	১৩৪৩	বড়ু চণ্ডীদাসের পদ	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
	১৩৪৪	চণ্ডীদাস	বসন্তরঞ্জন রায়
	১৩৪৬	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
	১৩৬০	চণ্ডীদাস সমস্যা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
	"	আধুনিক বৈষ্ণব গীতিকার	অমলেন্দু মিত্র
	১৩৬২	বিদ্যাপতির কবিতায় শৃঙ্গার রস	বিমান বিহারী মজুমদার
	"	বিদ্যাপতির পদে মধুর রস	ঐ
	১৩৬৩	বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ	ঐ
		শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কাল নির্ণয়	ঐ

প্রদর্শনী

জয়দেব

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ॥ জয়দেব বন্দনা

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়
পদ্মাবতী-রতি-কান্ত।
রাধামাধব- প্রেম ভক্তি রস
উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ নিগূঢ় লীলাগুণ
পদ্মাবলী-পদবৃন্দ ॥
কেন্দুবিল্ব পুর ধাম মনোহর
অনুখন করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ যো সরবস ধন
অহনিশি রহু তছু পাশ ॥
যুগল বিলাস গুণ করু আস্বাদন
অবিরত ভাবে বিভোর।
রঘুনাথ দাস ইহ তছুগুণ বর্ণন
কীয়ে করব লব-ওর ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব : ১৮৫৩

গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণ-মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালাদেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তৎসর্বোৎকৃষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বিদ্যাপতি ও জয়দেব ; মানস বিকাশ (বঙ্গদর্শন ১২৮০)

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এ জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন ; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।......

বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপতি দৃষ্টি করেন ; আর একদল বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল

মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য চরিত্রখানিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকুজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোম্মুথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্যপ্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের

কবিতা, উৎফুল্ল কমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি ; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতি কবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব যম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।

সংশোধন (বিবিধ প্রবন্ধ)

যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণচরিত্র (বঙ্গদর্শন ১২৮১)

তখন আর্য জাতির জাতীয়জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্র তেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্যবীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত এবং গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্কণ বাজিতেছে— বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাস রসে রসিক কিশোর

নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্তি, অপূর্ব মোহন মূর্তি; শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন। আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষ্ণাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিতেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ॥—জয়দেব: The Literature of Bengal. 1882

বঙ্গের আদি কবি এবং বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবি জয়দেব গোস্বামী। মোটামুটি ইহা সুনিশ্চিত যে বঙ্গে মুসলমান অধিকারের ঠিক পূর্বে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন।···

এখনকার ন্যায় সেই সময়েও বাংলাভাষাই ছিল নিঃসন্দেহে বাঙালীর মুখের ভাষা। কিন্তু পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন তাঁহাদের মহত্তম উত্তরাধিকার সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেন। ইহার ফলে সেই যুগের যাবতীয় বিদ্যাচর্চা, রাজসভায় যাবতীয় রচনা ও আলোচনা, এবং সর্বপ্রকার প্রথাগত এবং কুলপ্রশস্তি-সূচক গাথা রচিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের যাহা কিছু জ্ঞানচর্চা সমস্তই করিতেন এই পণ্ডিতী ভাষায়, এবং রাজাদের নিকটে কবিগণের যে প্রশস্তিবচন ও স্তুতিনিবেদন সকল কিছুই রচিত হইত মৃত সংস্কৃতের সুকঠিন ও কৃত্রিম শ্লোকে। ইহা অনেক পরিমাণে ইটালিদেশে দান্তে ও বোকাচ্চিওর যুগের ল্যাটিন ভাষা চর্চার ন্যায়। অথবা ইহা যেন মহান আলফ্রেডের সময়ে ইংরেজ লেখকদের দুর্বল রোমক ভাষা চর্চা। বিদেশী ভাষায় কিংবা মৃত ভাষায়

যে কোন প্রকার সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টাই দুর্বল হইতে বাধ্য। দ্বাদশ শতকেও বঙ্গদেশে একটি মাত্র ব্যতিক্রমস্বরূপে জয়দেবের রচনা ব্যতীত আর এই জাতীয় যাবতীয় প্রচেষ্টাই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়ায় বর্তমানে যথাযোগ্য কারণেই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত!

এই ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হইল কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গীতি গ্রন্থখানি পদসমৃদ্ধ কয়েকটি প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমেই পাঠককে যাহা আকর্ষণ করে তাহা হইল পদগুলির অসাধারণ সঙ্গীতগুণ। সংস্কৃত ভাষায় এবং পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় সম্ভবতঃ এমন গীতিময় কবিতা আর কদাপি রচিত হয় নাই। কাহারও মনে হইতে পারে যে সংস্কৃতের ন্যায় কৃত্রিম ও ধাতব-ধ্বন্যাত্মক ভাষায় এত কোমল ও তরল সুর ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব ব্যাপার. কিন্তু তাহা নয়, ইহা এমনই এক কুশলী হস্তের বীণা যে তাহাতে এমনই ললিত কোমল সুরের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে যে কোনোপ্রকার অর্থবোধের পূর্বেই কর্ণেন্দ্রিয় এক অপরূপ তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকে। এই বাঙ্গালী কবির হস্তে সংস্কৃত ভাষা তাহার সমস্ত প্রকার ধাতবকাঠিন্য ত্যাগ করিয়া যেন ইতালীয় ভাস্কর্যের কোমলতা লাভ করিয়াছে. এবং সুরের পুনরাবর্তন, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার গীতগোবিন্দকে সংস্কৃত ভাষায় এক উল্লেখযোগ্য অদ্বিতীয় রচনা রূপে মহিমান্বিত করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র গীতিগ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

এই গীতিগ্রন্থখানি কেবল যে সুরসমৃদ্ধ তাহাই নহে, ইহাতে নয়ন-মনোহর চিত্রবর্ণনার ঐশ্বর্যও কম নাই। যমুনার সুনীল তরঙ্গপ্রবাহ, শ্যামল তমালতলে শীতল ছায়ান্ধকার, ধীর সমীরণের কোমল মর্মর ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির শ্রবণসুখকর সুরসঙ্গীত, নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের অন্তরাল হইতে ভাসিয়া আসা কোকিলের সুরতরল কুহুধ্বনি, গোপীদের প্রণয়বিদ্ধ নিমীলিত নয়নের প্রেমাতুর কটাক্ষপাত, প্রেমিক-হৃদয়ের সানুরাগ প্রকাশ, নায়িকার ঈর্ষাতুর যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের

দারুণ বেদনা, এবং পুনর্মিলনের প্রচণ্ড উল্লাস,—সমস্তই অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে বীরভূমের এই অমর গীতিকবির গানে প্রতিফলিত হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥ জয়দেব (নবজীবন ১২৯৩)

জয়দেবের পদাবলী আজ আট শত বৎসর ধরিয়া সমানে একইভাবে গীত হইতেছে। কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি না জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ুদের সামগীতি (Psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানবজীবনের অত্যদ্ভুত স্ফুর্তিব্যঞ্জক বিকাশ, এবং মানবহৃদয়ের আশ্চর্য উচ্ছ্বাস হইলেও সঙ্গীত নহে ; তালের খেলা, তানের খেলা, যন্ত্রযোগে স্বরসঙ্গতি, দ্রুত বিলম্বিত, এসকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে, তালে, সুরে, লয়ে ভরপুর।

জয়দেব একদিক দিয়া দেখিলে যেমন বঙ্গের গীতিগঙ্গাস্রোতের হরিদ্বার স্বরূপ—আমাদের মূল প্রস্রবণ, চিরমহাজন, মহাগুরু এবং আদি কবি, সেইরূপ অন্যদিক দিয়া দেখিলে সংস্কৃত রূপ বিশাল ভারত সাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গাসাগর। হরিদ্বারই বল আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের সহজলভ্য নমুনা। সেই ঘননীল জলদোপম সতত চঞ্চল জলরাশির উপরি সহস্রখণ্ডে খণ্ডীকৃত শুভ্র স্ফটিকরাশি নিয়ত ভাঙিয়া পড়িতেছে—সেই সহস্র রশ্মির সহস্র কিরণ লক্ষ লক্ষ জল কণার অবয়বে নিয়ত প্রতিফলিত হইয়া মধুরে উজ্জ্বলে নানা বর্ণ বিকিরণ করিতেছে,—সেই নীল সলিল পৃষ্ঠে সমীরণের অপরূপ লীলাখেলা আর সেই অবিরাম গতি সমীরণের অঙ্কে সলিলের আনন্দকুন্দন,—সেই অবয়ব আবর্তনে যাদোগণের জলকেলি—আর সেই সাগরচর বকরাজির বক্ররেখায় বিচরণ—সকলই গঙ্গাসাগর হইতে দেখিতে পাই। জয়দেব আমাদের এই গঙ্গাসাগর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাগরের নমুনাও বটে, সহজলভ্য নিকটস্থ পন্থাও বটে। গীতগোবিন্দ হইতে সংস্কৃত কোমল কাব্য সাগরের সেই বিশাল, নীল, উজ্জ্বল, তরল, রসাল ছটা আমরা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি, এবং ক্রমে সেই পন্থা দিয়া মহাসাগরে নীত হইতে পারি।

মধুর কোমলকান্ত রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কঠোর বা উৎকট রসের পরিচয় পাওয়া যায় না। সমগ্র গীতগোবিন্দ মধ্যে, দুই চারটি মাত্র স্থলে উৎকটের একটু আধটু আভাস প্রাছে। একটি স্থলের উপমা অতুল্য, অমূল্য—

ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং॥

একটি উপমায় যেন জগৎ জাগিয়া উঠে; সেই উজ্জ্বল বিশাল, ঘোরাল, করাল কেতু করবাল দেখিয়াছি বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধনকারী কল্কিমূর্তিও চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

জয়দেবের ললিত কোমলকান্ত পদবিন্যাসের গুণে চিরপ্রসিদ্ধ উপমা সকলও নবকলেবর ও নবরস ধারণ করে; তাঁহার—'অনিল তরল কুবলয় নয়ন', 'বিকশিত-সরসিজ-ললিত মুখ', 'স্থল জলরুহ রুচিকর চরণ', 'নিকষ কনকরুচি শুচিবসন', 'প্রচুর পুরন্দর ধনুরনুরঞ্জিত মেদুর' মুদিত সুবেশং', 'শশিকিরণচ্ছুরিতোদর জলধর সুন্দর সকুসুম কেশং', 'রাধাবদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম্', জলনিধি-মিববিধুমণ্ডল দর্শনতরলিত তুঙ্গ তরঙ্গং',—এ সকলই সুন্দর ও মনোহর।

তাঁহার করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি কলিত শিঞ্জিতকারিণী নৃত্যপরা গোপিনীর বিলাস বর্ণন, আর, পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে, পাখীটি নড়িলে, পাতাটি পড়িলে, নায়িকার আগমন আশঙ্কা করিয়া নায়ক চকিত নয়নে ক্ষণে ক্ষণে পথপানে চাহিতেছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা প্রভৃতি শতবিধ চিত্র—সকলই বিচিত্র। বনস্থলীর প্রভাতের

মত সেই সকল চিত্র নিয়তই আপন আপন ভাবে ভোর হইয়া হাসিতে থাকে, আর ভাবুকের মনে ধীর মলয় সমীরে মৃদুমন্দ ভাসিতে থাকে।

জয়দেবের বসন্ত বড় জীবন্ত, বড় রসবন্ত। প্রকৃতির বসন্তে যেমন পুরাতন প্রায় শীত-শুষ্ক জগৎ আবার জীবন্ত রসবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, জয়দেবের কবিত্বগুণে, কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চিরপরিচিত, চিরব্যবহৃত পুরাতন সাধন সকল আবার তেমনি নবজীবন্ত হইয়া উঠে। মলয় সমীর কবিগুরু বাল্মীকি হইতেও পুরাতন, তবু যখন সেই মলয়সমীর কুসুমিতা ললিতলবঙ্গলতাকে ধীরে ধীরে দুলাইয়া, ভ্রমরভ্রমরীর গুঞ্জনের সহিত আপনার প্রাণ মিলাইয়া বনস্থলীর কুঞ্জকুটিরে সমাগত হয়, কে বল এমন আছে, যে একবার আহা বলিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ না করিবে। বকুলতলায় বকুল ফুল চিরদিনই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু তবু বকুলের থোলো থোলো ফুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর পড়িয়া, অমন জটাধারী যোগীর মত বকুলকেও আকুল করিতেছে—শুনিলেই পুরাতন বকুল যেন নব কলেবর ধারণ করে। বসন্তে সকলই বিকশিত, প্রফুল্লিত, চালিত, কুজনিত; এ সকল কথাই পুরাতন; সকল কথাই জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি শুনিতে পাই যে, জগতের লজ্জা গলিয়া গিয়াছে, তাই ছোট চারাটি, ক্ষুদে লতাটি, বৃহৎ বটরাজি, গভীর বন, অনন্ত আকাশ সকলেই হাসিতেছে, সকলেই নাচিতেছে, সকলেই গাহিতেছে, সকলেই মাতিয়াছে তাহা হইলে বসন্তের বসন্ত বুঝিতে, জয়দেবের কবিত্ব চিনিতে পারি।

দেখিতে গেলে জয়দেবের বার আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূল গ্রন্থারম্ভ সখীসম্বাদে; "রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী"। ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বন বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পও সখ্যুক্তি; "সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং।" ইহাতে শ্রীহরির রাসবিলাস বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গ, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গ শ্রীহরির স্বগতবিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে শ্রীহরি সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে রাধিকার নিকট সখী

সম্বাদ। ষষ্ঠে আবার শ্রীহরি নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণনা। সপ্তমে রাধিকা স্বগতা। সপ্তমে দ্বিতীয় কল্প, সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে রাধাকৃষ্ণ সংবাদ। নবমে সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধ দান। দশমে শ্রীহরি কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্প সখীসম্বাদ উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যন্ত মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম জয়দেবের বার আনা সখীসম্বাদ; তবে মাথুর সখীসম্বাদ জয়দেবের নাই। জয়দেবের সখীসম্বাদের প্রায় অর্ধেক বসন্ত ও বিরহ বর্ণন।

বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্মের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী। তিনি আমাদের মহাজন। তাহা হইতেই গীতিকাব্যের উৎপত্তি—তিনি আমাদের হরিদ্বার; বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুরু। তিনি গীতি-কাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্মজগতে জয়দেব কোমল করচন্দ্রমা; চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য। এই চন্দ্র সূর্যের আলোকে উত্তাপে বঙ্গ বৈষ্ণবের দিবাবিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী ॥ জয়দেব (ভারতী ও বালক ১২৯৮)

...জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন; প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্থির করিয়াছেন, এইজন্য কখনও তাঁহাকে কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। শরীরী ভাবটুকু প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি একেবারেই কবিতায় বাদ দিয়াছেন। কেহ কেহ আভাসে বুঝাইয়া দেন যে তাঁহারা শরীরের কথাটা একেবারে ভুলিয়া যান নাই—তাহা তাঁহাদের কবিতার ভিতর দিয়া ক্ষীণভাবে অন্তঃশীলা প্রবাহিত হইতেছে। কেহ বা তাহা ঘন কথার পল্লবে আবৃত করিয়া সাধারণের চক্ষের আড়াল করিয়া রাখেন।... গীতগোবিন্দ আসলে ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই—কেবল আদিরসের বিষয়ই

আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই—শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর হৃদয় নাই কেবলমাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রীসুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা। রাধিকা প্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়।...সুন্দরী যুবতীদিগের গাত্রের বন্ধুরতার অর্থাৎ উন্নত অবনত অংশ সকলের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক টান দেখা যায়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির বেশ কলাও বর্ণনা করেন। তাঁহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার বেশ পূর্ণ; কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার চেহারার বিষয় একটা কিছু পরিষ্কার ভাব মাথায় আসে না—কেবলমাত্র তাঁহার বক্ষস্থল যে নির্দয়রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত এবং তাঁহার করযুগল যে স্পর্শসুখলাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত এই দুইটি কথাই বিশেষরূপে মনে থাকে।··

...এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ, বিরহে পরস্পরের দুঃখ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন—অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধা-কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা। এ ছাড়া আনুষাঙ্গিকরূপে যমুনাতীর, কুঞ্জবন, বসন্তকাল, রাধার সখী ও অন্যান্য গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় ও ঈশ্বরের বন্দনা বাদ দিলে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের কেলি ব্যতীত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের অন্য কোন বিষয়, কোনও রূপ ধর্মনৈতিক কিম্বা নৈতিক মতামত, ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করে নাই।···ইহা আমার নিকট অত্যন্ত সুখের বিষয় মনে হইতেছে। কারণ কবির ক্ষমতার পরিসর যত সংক্ষিপ্ত হয় ও তাঁহার কল্পনা যত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা ততই সহজসাধ্য হইয়া ওঠে।··

জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাৎ একঘেয়ে। তাঁহার বিরহী-বিরহিণীদিগের নিকট যে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথা

তাহাই শুধু খারাপ লাগে। জয়দেব বিরহের ভাবের জন্য কোনও অংশ ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষস্ত্রীর যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবলমাত্র বেশভূষার বর্ণনাই দেখিতে পাই। তাহাতে অভিসারিকাগণের মনের আবেগ—প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কিরূপে নানাবিধ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে—এসকল বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। এ বর্ণনাও নেহাৎ একঘেয়ে।

তাঁহার বসন্ত বর্ণনায় প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নূতন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ববর্তী কবিরা যে সকল বসন্ত বর্ণনা লিখিয়াছিলেন —তাহা হইতেই তাঁহার বসন্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।···
তারপর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই জয়দেবের উপমা সকল প্রায়ই নেহাৎ চলিত গোছের। জয়দেবের পূর্বে সেই সকল উপমা শত সহস্র প্রকার সংস্কৃত কবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। জয়দেব কাব্যজগতের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র।

কিন্তু জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে—তাঁহার পরিকল্পিত দুচারিটি নূতন উপমাও গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারি দুএকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরি রূপ সম্বন্ধে বর্ণনায় বলিতেছেন—

'তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং'

ইহার দোষ প্রথমতঃ কমলের নখলাভ ও তৎকর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ নরসিংহের করযুগলকে কমলের সহিত তুলনা করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভৃঙ্গের সহিত তুলনা করায় উভয়ের ভিতর বিরোধ ভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়তঃ কৃষ্ণ নরহরি রূপ গ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দৈত্যকে যথার্থ স্বীয় বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও ভ্রমরের যুদ্ধস্বরূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য কতটা পরিমাণে বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা করিবেন।...

কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না—

তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদিতড়াগম্।

কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পদ্মের ভিতর খঞ্জনযুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের বিহার আমি ত দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই, এবং আমার বিশ্বাস ও রূপ কার্য খঞ্জনেরা কখনও করে না। এই উপমাটিও আমার নিকট যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।..

জয়দেবের ভাষা অতি সুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা ত সর্ববাদি-সম্মত। এমন কি যাহারা সংস্কৃত ভাষা অনভিজ্ঞ তাঁহারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে জয়দেবকে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখা যায়।...

জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ Rhythm অর্থাৎ ছন্দের তাল লয়ের অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দসকল একটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্য আর একটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অ কারান্ত শব্দের ব্যবহারে, পরস্পর শব্দসকলের হ্রস্বদীর্ঘাদির প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, সুতরাং তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য অভাবে, জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্যের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বাক্যের যে অংশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাও গাম্ভীর্য

ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধুর হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষা সম্বন্ধেও গাম্ভীর্যযুক্ত মাধুর্য, গাম্ভীর্যবিযুক্ত মাধুর্য অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং গীতগোবিন্দের সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় গাম্ভীর্যগুণ বিশিষ্ট হওয়ায় শেষোক্ত কাব্যের ভাষা পূর্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকৃষ্ট।...

শব্দ সকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া, তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যিনি রচনাকে শ্রুতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার রাজা। জয়দেব তাঁহার রচনায় হ্রস্বদীর্ঘাদির প্রভেদজনিত বন্ধুরতা ভাঙিয়া, মাজিয়া-ঘসিয়া এমন মসৃণ করিয়াছেন যে পড়িতে গেলে তাহার উপর দিয়া মন পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন বসাইতে না পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

গীতগোবিন্দে কথার বড় একটা কিছু অর্থ নাই বলিয়াই জয়দেব যে চাতুরী করিয়া যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে সেই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।...

যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিকভাব—মানব দেহের সৌন্দর্য যাহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান—যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক—এককথায় যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতার অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি, ভরসা করি এ বিষয়ে আপনারাও আমার সহিত একমত।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জয়দেব (সাধনা ১৩০০)

...গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন ; তিনি

খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য রাজ্যের পথে বাধা স্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পরশ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার প্রতিধ্বনি মাত্র ; এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষাঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।...

কিন্তু এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহা বল, এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, তবে এই জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। কবি যদি ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদিরা পানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্যবিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সেজন্য অপরাধী করে না।

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গম-ক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্যাপ্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করেনা—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী প্রগাঢ়তা এই মর্ত্যাধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ের ও সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে, দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত সেই প্রেমস্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর, তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতা-পুত্রভাব মর্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বরকে নানাভাবে দেখিয়াছে। এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানবভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক, ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

সুতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয়দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানব-

হৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাব-সুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতি-টুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরলভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত, তাহাই নাই।

এই অতিসচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গার রসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে। —প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে নব্যরুচির বিরুদ্ধভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় শ্লীলতা ও অশ্লীলতা রুচি অরুচি শরীর মন এ সমস্ত অতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানাছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।

নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই সেই নগ্নদেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে। এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য

মনে হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার নাই, ইঙ্গিত ইসারা নাই, নাগরিকতা নাই।

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।

কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তর মূর্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্তির সর্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয়ত জুতা রাখিয়াছেন, কিংবা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

বৈদিক পুরুরবা ও উর্বশীচিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সংকুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ কেকাধ্বনি, (১৩০৮)

জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতি প্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া যায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে, সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রীজয়দেব কবি। (ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩৫০)

গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম কবি, এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর গীতিকবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লন, শ্রীহর্ষ, জয়দেব। বাস্তবিক নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাঁহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে; জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি কবির পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জয়দেবের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১২ ও ১৩ শতকের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও শ্লোক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু উত্তরভারত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে এবং ভাষাসাহিত্যের উদ্ভবের ফলে পরবর্তী শতক সমূহে সংস্কৃত কাব্যাদি রচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মত জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না; এইজন্য এই ধারা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়।···

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিদ্যাগর্ভ সাহিত্যের নদী অবলুপ্ত গতিতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রীষ্টীয় ১৩র শতকের আরম্ভ হইতে জয়দেব কবির পরে যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগসন্ধির কবি, তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী দুভয়ই যেন যুগপৎ ঝঙ্কৃত হইয়াছে।···

শ্রীজয়দেব কবির জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই—তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং গৌড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন।···গীতগোবিন্দ কাব্য পাঠে আমরা জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম রামা দেবী (বা বামা দেবী অথবা রাধা দেবী), তাঁহার পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তাঁর এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন, যিনি গীতগোবিন্দের গান গাহিতেন। জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক অন্য কবিদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজ। অন্যত্র ইঁহাদের কথা শুনা যায়, ইঁহাদের রচনাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বের নাম তিনি গীতগোবিন্দে করিয়া গিয়াছেন।···

জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্যাপদের রচক বৌদ্ধকবিদের সমসাময়িক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থে গীত বলা

হইয়াছে, অন্যত্র এগুলি পদ নামে প্রচলিত। শিখদের আদিগ্রন্থেও জয়দেবের একটি গানকে 'পদা' অর্থাৎ পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জয়দেব নিজেও এগুলিকে পদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—

'মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্,

গীতগোবিন্দ, ১।৩

উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষা-গ্রথিতরূপে এই গীত বা পদগুলি মিলিলেও বৌদ্ধচর্যাপদের মত গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়।

জয়দেবোত্তর মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি মুখ্য ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, একটি কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোন দেবতা বা অবতার অথবা ঐতিহাসিক বা অন্যবিধ মহাপুরুষের কাহিনী বা জীবনী বিধৃত থাকে; এইপ্রকার কথাত্মক কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গল বলা হইত। মঙ্গলকাব্যে নিখিল ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা বা অবতারকে লইয়া কথা রচিত হইত—যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র, অথবা কেবল গৌড়বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পাত্রপাত্রীদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইত যেমন—ধর্মদেব ও লাউসেন, মনসা ও চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দর বেহুলা ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর, কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্লরা অথবা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বা ক্বচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের পূতচরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্মসম্বন্ধীয় অথবা ধর্মাশ্রয়ী বা লীলাশ্রয়ী শৃঙ্গাররসের কিংবা পার্থিব প্রেমের গান; এই গানের ধারাকে পদ বলা হইত। বৌদ্ধচর্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজনপদ, সহজিয়া পদ, দেহতত্ত্বের গান, রামপ্রসাদ প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউলের, মুসলমান মারফতী গান প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতির বিভিন্ন ধারা এই পদসাহিত্যেরই অন্তর্গত। জয়দেবের গীতগোবিন্দস্থ পদাবলী মধ্যযুগের বাঙ্গালা পদসাহিত্যের

সূত্রপাতস্বরূপ চর্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদ বাঙ্গালা পদসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার প্রেমের গান,— জয়দেবের পদেই এই গীতিগঙ্গার গঙ্গোত্তরী মিলিতেছে। অপর জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যও বটে ; সেই হিসাবে ইহা একটি মঙ্গলকাব্য। একাধারে পদ ও মঙ্গল উভয়ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে, তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে পদাবলী বা পদসংগ্রহ। জয়দেব স্বয়ং ইহাকে মঙ্গল অর্থাৎ 'মঙ্গলকাব্য, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি।" অর্থাৎ শ্রীজয়দেব কবিরচিত উজ্জ্বলরসের অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গলকাব্য আনন্দ দান করে।

সুতরাং স্বদেশ ও স্বদেশভাষার সাহিত্যের দুইটি মুখ্যধারার অগ্রণী বলিয়া জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে পারে।

যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালারূপ মিলিতেছে না, এবং যদিও আদিগ্রন্থধৃত দুইটি মিশ্রভাষা সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহনকর্তা, মধ্যযুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া মর্যাদার আসন দিতে পারি, যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীনধারার মুসলমান পূর্বযুগের সংস্কৃতের অন্তিম মহাকবি। সংস্কৃত ও ভাষা, উভয়প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট প্রভাবের কথা মনে করিয়া এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে তিনি যে একজন মহাজন অর্থাৎ ভক্ত কবি বলিয়া বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদাস ষোড়শশতকে তাঁহার 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধপদে জয়দেবের যে প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন,তাহা সুন্দর ও সার্থক—

জয়দেবকবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ।।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ।
কোক-কাব্য-নবরস-সরস শৃঙ্গার-কৌ আগর ।।
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ ।
রাধারমণ প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ ।।
সন্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি ।
জয়দেব কবি নৃপ চক্কবৈ, খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আনি কবি ।।

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্যকবিগণ খণ্ডমণ্ডলেশ্বর (ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিনলোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুরভাবে উজ্জ্বল (উজাগর) হইয়াছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র) কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী গীত অভ্যাস করে, তাহার বুদ্ধিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত (ভক্ত) রূপ কমলদলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী সুখজনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ডমণ্ডলেশ্বর মাত্র।

সুশীল কুমার দে—জয়দেব ও গীতগোবিন্দ। (নানা নিবন্ধ ১৩৬০)

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবর্ণনায় দ্বাদশ সর্গে জয়দেবের অপূর্ব কাব্য-গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সর্গবন্ধ কাব্যের আকারে লিখিত হইলেও ইহা ঠিক সংস্কৃত আদর্শে গঠিত নয়। আখ্যানভাগ বা বর্ণনার জন্য মধ্যে মধ্যে মামুলী সংস্কৃত ছন্দেরচিত শ্লোকাবলী দ্বারা ইহার অসংবদ্ধ পদাবলীগুলি একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই পদগুলিই ইহার সর্বস্ব। জয়দেবের নিজের ভাষায়, কাব্যখানি 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী'র সমষ্টিমাত্র। সমস্ত কাব্যটি[illegible]কৃষ্ণ রাধা ও সখীর উক্তিগুলি সুরতালে গেয় আকারেই সজ্জিত। সুতরাং ইহাকে সত্যকার গীতিকাব্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু গীতিকবিতার মধ্যে আখ্যান, বর্ণনা ও সংলাপ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। সর্গবর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক সর্গের

পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর'। রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সরস বসন্তের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণের সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন। কৃষ্ণের পূর্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া রাধা ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় দামোদর আজ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যত্র সুখসম্ভোগে মাতিয়াছেন। রাধার এই স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া সর্গটির নাম 'সামোদদামোদর'। দ্বিতীয় স্বর্গের নাম 'অক্লেসকেশব।' রাধা সখীর নিকট পুনর্বার মিলনের উৎকণ্ঠায় মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কেশব ক্লেশরহিত। তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুসূদন'। গোপীদের পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ ও অনুতপ্ত চিত্তে রাধার অন্বেষণ করিতেছেন। চতুর্থ সর্গ 'স্নিগ্ধমধুসূদন'। রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ভাবনা-লীনা বিরহদীনা রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ'। সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাধা আবার অভিসারে আসিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় ধীর সমীরে যমুনা তীরে পুণ্ডরীকাক্ষ অপেক্ষা করিতেছেন। ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ'। রাধার বাসকসজ্জা বর্ণনা করিয়া সখী যেন বলিতেছেন, হে ধৃষ্ট তুমি কি এখনও কুণ্ঠাশূন্য থাকিবে? সপ্তমসর্গ 'নাগরনারায়ণ'। বহুবল্লভ নাগরের ছলনায় বিরহখিন্না রাধা এখন বঞ্চিতা ও বিপ্রলব্ধা। অষ্টম সর্গ 'বিলক্ষলক্ষ্মীপতি। খণ্ডিতা নায়িকারূপিনী রাধার দুর্জয় মান দেখিয়া লক্ষ্মীপতি তাঁহার পদসেবিকা লক্ষ্মীর তুলনায় রাধার প্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নবম সর্গ 'মুগ্ধমুকুন্দ'। কলহান্তরিতা রাধার মানভঞ্জনের চিন্তায় মুকুন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। দশম সর্গ 'চতুরচতুর্ভুজ'। মানিনীর পদযুগল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ এখানে স্তুতি ও চেষ্টায় চতুর। একাদশ সর্গ 'সানন্দগোবিন্দ'। মানভঞ্জনের পর মিলন সম্ভাবনায় গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। দ্বাদশ সর্গ 'সুপ্রীতপীতাম্বর'। রাধাকে স[illegible]রূপে পাইয়া পীতাম্বর এখন সুপ্রীত ও কৃতার্থ।

শুধু ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্বরাগ হইতে মিলন

পর্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্বগামী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার কাব্যে এমন কোনও বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ববর্তী কবিগণের দ্বারা বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। কিন্তু মূল বিষয়টি অথবা ইহার আনুষাঙ্গিক ভাব-রাজি পুরাতন ঐতিহ্য বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহৃত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাহার নিজস্ব। কেবল ভাব বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহার উৎকর্ষ নয়; এ সকল চিরাগত ভাব বা সর্বসাধারণ বিষয়ে সে স্বতন্ত্র আকার ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে তাহাতেই তাহার বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য যে জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটি সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভঙ্গি, ছন্দ—এক কথায় ইহার গঠনশিল্পের চমৎকারিতা মনকে সহসা চকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহিরঙ্গরূপ, এই উভয়েরই সমগ্রতা লইয়া কবির কাব্যপ্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাঁহার কাব্যের রসরূপ বলিতেছি।

কিন্তু কেবল শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যকে তাঁহার কাব্যপ্রতিভার সর্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজ কবি কীটস বলিয়াছেন—Poetry must surprise by its fine excess. গীতগোবিন্দে একথা খুব খাটে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য তো আছেই; কিন্তু fine এই শব্দটির দ্বারা শিল্পীর এই যে সংযম ও নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গীতগোবিন্দের লিপিকুশলতায় বর্তমান। বাগর্থের পরস্পরসাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্যলিখনে দক্ষতা, ধ্বনিবৈচিত্র্য, ছন্দসাচ্ছন্দ পদলালিত্য ও গীতিমাধুর্য, এই কাব্যটিকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু কাব্যকলার অপরিমিত স্ফূর্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্‌ভ্য নাই। শিল্পনৈপুণ্যের সূক্ষ্মতা থাকিলেও অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই। ইহার কান্ত কোমলতা ও

সাচ্ছন্দগতি মনকে তন্ময় করিয়া দেয়। নিছক শব্দসম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দবিন্যাসনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্রপরম্পরার যে অন্তর্লীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার অসামান্য প্রয়োগে সমৃদ্ধ এতাদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পীকবি দুর্লভ।

বুদ্ধদেব বসু ॥ (মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা—১৩৬৪)

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী/হরতিদরতিমিরমতি ঘোরম্' —এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য চাটুকারিতা মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা শুনতে পেলাম, যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-করা বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'ত্বমসি মম ভূষণম্'।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্— সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হ'য়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত—আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলো যুক্তিনির্ভর কার্পণ্য ছাড়িয়ে মুক্তির দিকে। 'তুমিই আমার ভূষণ' —এই একটি কথাই বলে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বতা ও আবিষ্কারধর্ম; মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহির্ভূত, সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষা সব লজ্জা ভয় ত্যাগ করলে।

বিষ্ণাপতি

গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥ বিষ্ণাপতি বন্দনা ।

কবি-পতি বিদ্যাপতি মতিমানে ।
লাখ গীতে জগ-   চীত্ত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণী ।
তাকর সার   সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥
যো সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া ।
সো সুখ সার   সার সব রসিকক
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া ॥
আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহা ।
সো আনন্দ-রস   জগভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি-রস-মেহা ॥
যত যত রসপদ করলহি বন্ধে ।
কোটি হুঁ কোটি   শ্রবণ যব পাইয়ে
শুনাইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥
সো রস শুনি নাগর বরনারি ।
কিয়ে কিয়ে করি   চীত চমকাওই
ঐছন রসময় চম্পূ বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে ।
এত সুখ-সম্পদ   কহইতে আন মন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণচরিত্র (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১)

…বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীনে ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবনবলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদের পূর্বগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয়জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেব প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ্ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোর বয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজে দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ বিদ্যাপতি ; (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২)

বিদ্যাপতি বঙ্গকাব্যকাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কতশত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে ; কত প্রেমিকের পুলকিততনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বরলহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমনবার্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি,

তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্তু পর্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। তিনি যে মৈথিল কবি, তদ্বিষয়ে প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে।

(১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপ-নারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়।

(৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালাদেশে নাই।

(৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

(৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়।

(৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন।

(৮) বিদ্যাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

(১০) বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গনাগনের স্নানবিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নহে। বল্লালসেন বাঙ্গলাদেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালী রাজা হইলেও, বাঙ্গালীরা লক্ষ্মণসংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গলার অংশ ও তন্নিবাসিদিগকে বাঙ্গালী বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্তিমান হইয়া প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান স্থান। এখানেই যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হন। এখানেই ন্যায়মত প্রবর্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলস্বামী প্রাদুর্ভূত হন। এখান হইতেই ন্যায়শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি ও

চৈতন্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিভা প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া সারদচন্দ্রিকা-বিনিন্দিত নির্মলবুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়বিষয়ে নবদ্বীপকে ভারত শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্যাপতির সরস কবিতা নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গালা মিথিলার নিকটে ঋণী।

রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। The literature of Bengal—1882

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। উভয়েই উচ্চ পর্যায়ের কবি, উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছিলেন, উভয়েই অশেষ সঙ্গীতমাধুর্যের জন্য উল্লেখযোগ্য এই পর্যন্তই উভয়ের সাদৃশ্য। বিদ্যাপতি তাঁহার কবিকল্পনার চূড়ান্ত ঐশ্বর্যে, ভাবের বিস্তৃত পরিধিতে, বিচিত্র উপমার দক্ষ কারুকার্যে উৎকৃষ্টতর; চণ্ডীদাস কিন্তু তাহার পরিবর্তে সহজ সরল আন্তরিকতার গুণে মাধুর্যময়। বিদ্যাপতি নিসর্গজগতের ও শিল্পজগতের অশেষ ভাণ্ডার হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য আহরণ করিয়া কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন; চণ্ডীদাস অন্তরের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া খুব সহজস্বরে প্রেমিকের হৃদয়ে ভাবের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় আছে ভাবের আন্তরিকতা এবং গভীর কারুণ্য। বিদ্যাপতি এই সমস্ত গুণগুলিকে দ্রুতচারী কল্পনার সাহায্যে এবং অসাধারণ অলঙ্কারের দ্বারা অশেষ বৈচিত্র্যময়ী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উভয় কবির রচনার ত্রুটিগুলিও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। চণ্ডীদাসের রচনা ক্লান্তিকর, অনেক সময় একঘেয়ে, বিদ্যাপতির রচনা অতিশিল্পিত, এবং অতি অলঙ্কারের দোষে অস্পষ্ট। একই সঙ্গে উভয়েই প্রেমিকের হৃদয় উদ্ঘাটনে প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয়েই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রেমের প্রথম বেদনাময় অভিজ্ঞতা, বন্যাধারার মতো প্রেমের অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ, বিচ্ছেদের তিক্ত বেদনা,

ঈর্ষার তিক্ততর যন্ত্রণা, আশার আনন্দ এবং নৈরাশ্যের কষ্টকর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।...

বিদ্যাপতির ক্ষমতা মূলতঃ অলঙ্করণ ও চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টিতে। এমন কি বিষাদ ও করুণ মুহূর্তের বর্ণনাতেও বিদ্যাপতি বিচিত্র চিত্রালঙ্কারের উপর নির্ভর করেন এবং খুব কম সময়েই চণ্ডীদাসের ভাবরাজ্যে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। আবার অন্যদিকে যে সমস্ত বর্ণনায় দ্রুতচারী কল্পনা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন, বিদ্যাপতি সেক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে অনেক পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি পণ্ডিত এবং পরিশীলিত কবি, দূরবিস্তারী কল্পনার এবং বহুবিচিত্র ভাবের শিল্পী কবি। চণ্ডীদাসের এই সমস্ত গুণ নাই, কিন্তু তিনি গভীর ভাবের ও তীব্র আবেগের কবি। তিনি নিসর্গের সন্তান, এবং তাঁহার কবিতায় শোনা যায় গ্রাম্যবিহঙ্গের অরণ্যকাকলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ বিদ্যাপতির রাধিকা (সাধনা ১২৯৮)

গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ, সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙ্গে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সঙ্গীতধ্বনি। দুঃখ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সুখ-দুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ, নয় দুঃখ, হয় মিলন, নয় বিরহ, এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ। চণ্ডীদাসের মত সুখে দুঃখে বিরহমিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।...

বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্যে ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা মর্মঘাতী নহে। কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে ও পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।...

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্য বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন রাখিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥

হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে, আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের অশ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য।...

এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে, কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ

পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ব-বিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।...

কখনো দেখা হয়, যমুনার জলে অথবা স্নান করিয়া ফিরিবার সময়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হয় না! একে অল্পক্ষণের দেখা তাহাতে অধৈর্য চঞ্চল দোদুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়—মনকে শান্ত করিয়া, ধৈর্য ধরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না—যেটুকু দেখা গেল সে কেবল—

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধ হি নয়ানতরঙ্গ।

কিন্তু 'ভাল করি পেখন না ভেল'।

তাহার পর কত আসা যাওয়া, কত বলা কওয়া, কত ছলে কত ভাবপ্রকাশ, কত ভয়, কত ভাবনা,—অবশেষে একদিন মধুর বসন্তে নবীন মিলন; কিন্তু তাহাও নিবিড়, নিগূঢ়, নিরতিশয় মিলন নহে। তাহার মধ্যে কত আশা, কত আশ্বাস, কত কৌতুক কত ছন্দলীলা, কত মান অভিমান, সাধ্য সাধনা। আবার সখীর সহিত পরামর্শ, সখীকে ডাকিয়া গৃহকোণে নিভৃতে বসিয়া নানাছলে এবং কথার কৌশলে আপনার সুখস্মৃতি লইয়া আলোচনা। নবীনার নবপ্রেম যেমন মুগ্ধ যেমন বিচিত্র কৌতুক কৌতূহল পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই কম নাই।

চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।...

এইখানেই শেষ করা যাইত। কিন্তু এইখানে শেষ করিলে বড় অসমাপ্ত থাকে। ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে অশেষ কথা বলা যাইতে পারে। এত লীলা খেলা নবনব রসোল্লাসের পরিণাম কথা এই যে,

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী॥ (বিদ্যাপতি কীর্তিলতার ভূমিকা, ১৩৩১)

বিদ্যাপতি বাঙ্গালার ও মিথিলার একজন আদি মহাকবি। তিনি একাধারে সম্পন্ন গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি পদকর্তা, সভাসদ, রাজ-কর্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় নানাগ্রন্থের গ্রন্থকার। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি গান বাঁধাতেই হইয়াছিল। তাঁহার গানে যে শুদ্ধ মিথিলার লোকেই মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন নহে, সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল। বেশী হইয়াছিল বাঙ্গালী। চৈতন্যদেব তাঁহার গান বড় ভালবাসিতেন। সুতরাং চৈতন্য সম্প্রদায়ের সব লোকই বিদ্যাপতির গোঁড়া ছিলেন। চৈতন্যের সময়ের এবং পরের অনেক পদকর্তা বিদ্যাপতির নকল করিতেন। ভাবের নকল তো করিবেনই ভাষারও নকল করিতেন। বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গালায় যে ভাষা হয় তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন সম্পর্ক নাই। সেটা সেকালের মৈথিলী ভাষার ছায়ামাত্র। ব্রজ-বুলিতে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্তারাও ব্রজবুলিতে গান লিখিতেন।...

বিদ্যাপতিকে আমরা প্রধানতঃ তিনমূর্তিতে দেখিতে পাই। এক মূর্তিতে তিনি পণ্ডিত, সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর এক

মূর্তিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদিরসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদগদ হইতেছেন। তাঁহার আরও এক মূর্তি আছে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন—কীর্তি-সিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন, এই সকল কথা তিনি তাঁহার তৃতীয় মূর্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের গানগুলি তাঁহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে।···

তিনি ছিলেন রাজকবি, রাজপারিষদ। রাজারা বা রাজসভাসদেরা যেমন ফরমাইস করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন। রাজসভায় খুব একটা আনন্দ হইত। অনেক সময়ই তাঁহাকে ফরমাসকর্তাকে শ্যাম সাজাইতে হইত এবং তাঁহার সোহাগিনীকে রাধা সাজাইতে হইত। তাই করিয়াই বিদ্যাপতির এত আদিরসের গান সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কীর্তন লিখিতেও বসেন নাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। গানগুলি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মত লেখা হইয়াছিল। ইদানীন্তন বৈষ্ণবেরা যে রসে যেটি খাটে কীর্তনে সেইটিকে সেইখানে বসাইয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এমনকি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গানগুলিতে সেগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক

সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃতশ্লোক মনে পড়ে। অনেক সময় বোধ হয়, এই সকল সংস্কৃত কবিতার উপর বিদ্যাপতি রঙ্ চড়াইয়াছেন। তাহাদের ভাব লইয়া বেশী করিয়া ফুটাইয়াছেন। সময় সময় স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরীরের কোন অঙ্গেরই নাম করেন নাই, কিন্তু অঙ্গগুলির উপমানগুলিকে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, যে, যে সংস্কৃত না পড়িয়াছে সে তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। পারিলেও অনেক কষ্টে করিতে হইবে।...

বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানোর তারিফ। তাহাতে এমন একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। বিদ্যাপতি বহির্জগতেই হউক আর অন্তর্জগতেই হউক সুন্দর সুন্দর জিনিস বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন।...

বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতুবর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতি মিষ্ট, সুর অতি মিষ্ট। সংস্কৃত ঋতুবর্ণনার যা কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি ছোট, একটা পুরা কিছুর বর্ণনা ভাল করিয়া করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং দু'চারিটি অতিমিষ্ট জিনিষ একত্র করিয়া গানটি শেষ করিতে হইয়াছে। বেশী কথা বলিবার জায়গা নাই, সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত পড়িয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা ছাড়া নূতন জিনিষ কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াই গান থামিয়া যায়।...

বিদ্যাপতি কীর্তনের গান লিখেন নাই। তাঁহার দু দশটি গান লইয়া কীর্তনীয়ারা তাহাদের কীর্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় তাঁহার কিছুই আপত্তি ছিল না। তিনি শিব গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাঁহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। সৌন্দর্য সৃষ্টি

করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্যের খনি, তিনি বহুসংখ্যক আদিরসের গান লিখিয়া গিয়াছেন। আদিরসের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম খুব বড় জিনিস, তিনি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণ রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসের প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজসভায়, ব্রাহ্মণ রাজার সভাসদগণের মধ্যে, বাহিরে একটা পবিত্র ভাবদেখান, একটা সংযত ভাব দেখান, একটা ধর্মের ভাব দেখান, খুব দরকার ছিল। বিদ্যাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়। রাজা ও সভাসদেরাও ত রাজা ও রাজসভাসদই ছিলেন ; গান, বাজনা, কাব্য কবিতা, হাসি মস্করা এসবও ত তাঁহাদের সভায় ছিল। এগুলিও বিদ্যাপতি বেশ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজগণের কাব্যপ্রিয়তার কথা বিদ্যাপতি এক জায়গায় এইরূপে বলিয়াছেন—

গেহে গেহে কলৌ কাব্যং শ্রোতা তস্য পুরে পুরে।
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি দুর্লভঃ ॥

দাতা জগতি দুর্লভঃ, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই কাব্যামোদী ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁহাদের সময় মিথিলায় বিদ্যাপতির মত রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল।

বিদ্যাপতিকে আমরা এপর্যন্ত যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি মাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না। ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজকর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং অল্পভোগী রাজাদিগের যে বিশেষ কর্তব্য কর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই কার্যটি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটি মুসলমান বিধ্বস্ত হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচার। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গীতও তাঁহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 'বিদ্যাপতি (বাংলা সাহিত্যের কথা, ১৩৫৩)

বিদ্যাপতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একেবারে অবিমিশ্র বৈষ্ণব প্রতিবেশ হইতে তাঁহার কাব্যপ্রেরণা স্ফুরিত হয় নাই। তাঁহার ধর্মমত যে কি ছিল তাহা লইয়া তর্কবিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চোপাসক ক্রিয়াবান্ মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। খাঁটি বৈষ্ণবেরা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় পূর্ণ-ভাবে রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া দাবি করেন। এ প্রশ্নের মীমাংসার যথেষ্ট উপাদান না থাকিলেও, তাঁহার পদাবলীর প্রমাণে বলা যায় যে তাঁহার ভক্তি শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর উপরই ন্যস্তহইয়াছেএবংএই সমস্ত কবিতাতে আন্তরিকতার সুরের কোন ইতরবিশেষ লক্ষ করা যায় না। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ আত্মবিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তিবিহ্বলতার সহিত রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের মাধুরীর অনুধ্যান করিয়াছেন, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে সেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিষ্ঠার নিদর্শন মিলে না। তাঁহার উদার ধর্মমত ভগবানের সমস্ত রূপের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছে। তাহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব। তিনি যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ মহাদেবের খেয়াল ও পাগলামীতেও স্নিগ্ধ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার রুধিরলিপ্তা, লোলাজিহ্ব মহাকালীর মূর্তিরও ভয়াবহ মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম সাম্প্রদায়িকভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্বে, প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী ভক্তিপ্লাবনের বেগ ইহাতে সঞ্চারিত হইবার পূর্বে, ইহা একজন বিদগ্ধ চতুর রাজসভার আবেষ্টনে বর্ধিত কবির কল্পনাকে কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত খাঁটি বৈষ্ণব কবির সহিত তাঁহার রচনার সুরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কি প্রভেদ, বিদ্যাপতির

কবিতা (যদি তাঁহার আসল কবিতা পৃথক করা সম্ভব হয়) আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে।

বিদ্যাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার রচনা হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত হইবেনা যে, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী ঠিক খাঁটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার ও অপক্ষপাত মনোভাব তাঁহার বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিমূলক রচনাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সুবিখ্যাত পদে তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসনা অতিক্রম করিয়া বিরাট বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমার জয়গান করিয়াছেন। বরং তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিবের প্রতি পক্ষপাতিত্বই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'কীর্তিলতা'র মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব করা হইয়াছে। জোনপুর নগরের প্রাসাদ সৌন্দর্য বর্ণনায় কনক-কলসমণ্ডিত ধবল শিবমন্দিরশোভা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধঅ ধবলঁ হর ঘর সহস পেখ্ খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিআ।"

এইরূপ উপমা ও অলঙ্কার সন্নিবেশ হইতে লেখকের মানসপ্রবণতা, তাঁহার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। যখন দুই রাজ্যচ্যুত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রজে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সুলতানের নিকট যাত্রা করিলেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া দর্শকদের মনে রাম-লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণবলভদ্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে। হয়ত এই গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া ইহাতে মধুররস অবতারণার বিশেষ অবসর নাই, কাজেই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ ইহার বিষয়বস্তুর সহিত খাপ খায় না। তথাপি মনে হয় যে, যদি লেখকের চিত্তে তাঁহার পরবর্তী যুগের পদাবলী রচয়িতাদের ন্যায় এই

অনুপম প্রেমরসে অভিষিঞ্চিত থাকিত, তবে কোন না কোন উপলক্ষে, উপাস্য দেবতার প্রতি স্তুতিনিবেদন বা উপমানির্বাচন ব্যাপদেশে এই অমৃতধারার দুই এক বিন্দু যে ক্ষরিত হইত তাহাতে সংশয় নাই। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে যে বিদ্যাপতির স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে কৃষ্ণোপাসনার অসপত্ন একাধিপত্য ছিল না। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্টা কতটা যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুবর্তন, কতটা যে অন্তর্নিহিত ভক্তিপ্রেরণার অনিবার্য প্রকাশ—তাহা ঠিক করিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার রচনায় এই দুই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং সমালোচকের কর্তব্য—এবিষয়ে কোন পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া, খোলা মন রাখিয়া প্রত্যেকটি পদের বিচার ও এই বিচার-প্রক্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ।

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহার রচনা তালিকা হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা ছাড়া তিনি শিব, দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দিক দিয়া হয়ত রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিদ্যাপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যে, অলঙ্কারে, দার্শনিক ও রসতত্ত্ব আলোচনায়, সংস্কৃত বাংলা ও ব্রজবুলির মধ্যবর্তিতায় এক রাধাকৃষ্ণলীলারই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোন এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রত্যেক গ্রন্থে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। পদাবলী রচনা তাঁহার বহুবিস্তৃত সাহিত্যপ্রচেষ্টার অন্যতম অংশমাত্র।

কবিতা (যদি তাঁহার আসল কবিতা পৃথক করা সম্ভব হয়) আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে।

বিদ্যাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার রচনা হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত হইবেনা যে, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী ঠিক খাঁটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার ও অপক্ষপাত মনোভাব তাঁহার বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিমূলক রচনাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সুবিখ্যাত পদে তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসনা অতিক্রম করিয়া বিরাট বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমার জয়গান করিয়াছেন। বরং তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিবের প্রতি পক্ষপাতিত্বই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'কীর্তিলতা'র মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব করা হইয়াছে। জোনপুর নগরের প্রাসাদ সৌন্দর্য বর্ণনায় কনক-কলসমণ্ডিত ধবল শিবমন্দিরশোভা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধঅ ধবলঁ হর ঘর সহস পেখ্‌থিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিআ।"

এইরূপ উপমা ও অলঙ্কার সন্নিবেশ হইতে লেখকের মানসপ্রবণতা, তাঁহার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। যখন দুই রাজ্যচ্যুত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রজে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সুলতানের নিকট যাত্রা করিলেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া দর্শকদের মনে রাম-লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণবলভদ্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে। হয়ত এই গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া ইহাতে মধুররস অবতারণার বিশেষ অবসর নাই, কাজেই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ ইহার বিষয়বস্তুর সহিত খাপ খায় না। তথাপি মনে হয় যে, যদি লেখকের চিত্তে তাঁহার পরবর্তী যুগের পদাবলী রচয়িতাদের ন্যায় এই

অনুপম প্রেমরসে অভিষিক্তিত থাকিত, তবে কোন না কোন উপলক্ষে, উপাস্য দেবতার প্রতি স্তুতিনিবেদন বা উপমানির্বাচন ব্যাপদেশে এই অমৃতধারার দুই এক বিন্দু যে ক্ষরিত হইত তাহাতে সংশয় নাই। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে যে বিদ্যাপতির স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে কৃষ্ণোপাসনার অসপত্ন একাধিপত্য ছিল না। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্টা কতটা যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুবর্তন, কতটা যে অন্তর্নিহিত ভক্তিপ্রেরণার অনিবার্য প্রকাশ—তাহা ঠিক করিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার রচনায় এই দুই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং সমালোচকের কর্তব্য —এবিষয়ে কোন পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া, খোলা মন রাখিয়া প্রত্যেকটি পদের বিচার ও এই বিচার-প্রক্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ।

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহার রচনা তালিকা হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা ছাড়া তিনি শিব, দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দিক দিয়া হয়ত রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিদ্যাপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যে, অলঙ্কারে, দার্শনিক ও রসতত্ত্ব আলোচনায়, সংস্কৃত বাংলা ও ব্রজবুলির মধ্যবর্তিতায় এক রাধাকৃষ্ণলীলারই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোন এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রত্যেক গ্রন্থে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। পদাবলী রচনা তাঁহার বহুবিস্তৃত সাহিত্যপ্রচেষ্টার অন্যতম অংশমাত্র।

ইহা ছাড়াও, বিদ্যাপতি আজীবন মিথিলা-রাজসভা ও রাজবংশের একাধিক প্রতিনিধির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। রাজসভায় থাকিয়া তিনি যে শুধু সাধারণ রাজকবির ন্যায় রাজার উদ্দেশ্যে মামুলি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহা নহে ; বিচিত্র ও উত্তেজনাপূর্ণ, ভারতীয় কবির পক্ষে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিত-কালে মুসলমান বিজয়ের তরংগোচ্ছ্বাস তাঁহার জন্মভূমি তিরহুতের উপর আসিয়া পড়িয়া এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। বিদ্যাপতি এই বিপ্লবের সমস্ত উন্মাদনা, ইহার সমস্ত অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত লক্ষ করিয়াছেন ও তীব্র, অকুন্ঠিত বাস্তব রসপ্রীতির সহিত তাঁহার কীর্তিলতায় বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্য ও তাম্রশাসনে রাজার বিজয়াভিযানের যে বিশেষত্ববর্জিত সমাস ও অলংকারের প্রাচুর্যে গুরুভারাক্রান্ত বাস্তববোধহীন বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। বিদ্যাপতির যুদ্ধবর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শীর ছাপমারা। কবি যেন সৈন্যসমাবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার যুদ্ধযাত্রার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি এই অভিযানপর বিরাট বাহিনীর সমস্ত কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা, ইহার উচ্ছৃঙ্খল কৌতুকপ্রিয়তা, ও অকারণ নিষ্ঠুরতা, প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার উপর ইহার ক্রূর ও অশুভ প্রভাব নিখুঁত রসগ্রাহিতা ও সত্যদৃষ্টির সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। রণাংগণের সংঘর্ষ ও মত্ত আস্ফালন, ইহার ধূলিজাল ও শোণিতস্রোত, ইহার ঘূর্ণিবায়ুর মত অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ ও ধ্বংসলীলা সম্বন্ধেও লেখক ঠিক একই প্রকারের বাস্তবপ্রধান মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণত: কাব্যপুরাণে আমরা যে সভ্যভব্য, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত সুপরিচিত রণনীতির অনুসারী দ্বৈরথযুদ্ধের বর্ণনা পাই, ইহা মোটেই সেই জাতীয় নহে। তারপর হিন্দুমুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম সংঘর্ষের পর উভয় জাতির পরস্পরের প্রতি মনোভাব, প্রথম বিরোধের তীব্রতা উপশমের পর পরস্পরকে মানিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশিসুলভ সহনশীলতার

উদ্ভব, বিজেতা মুসলমানের ঈষৎ আত্মপ্রাধান্যগর্ব, সুলতানের প্রসাদ লাভের জন্য হিন্দুরাজন্যবর্গের দরবারে ধৈর্যশীল প্রতীক্ষা—ইত্যাদি ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এই গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়। যে বিদ্যাপতি এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়াছেন ও রাজনৈতিক আলোচনা ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা কোন প্রকারেই সাধারণ বৈষ্ণব কবির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিনা। বৃন্দাবনের নির্জন নিকুঞ্জে ধ্যানবিভোর, নিছক অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টন ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় হইতে নিবর্তিতদৃষ্টি, সংসারবিমুখ কবির সহিত তিনি সমগোত্রীয় ছিলেন না। পদাবলী সাহিত্যের সুবৃহৎ অংগনে নামকীর্তনে তিনি ইহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সুরসাম্যের পিছনে সম্পূর্ণ প্রেরণাগত ঐক্য ছিল কিনা সন্দেহ।

রাজসভার সহিত আজীবন সংস্রবের ফলে বিদ্যাপতি একটি বিশেষ গুণ অর্জন করিয়াছিলেন—যাহাকে বাগ্‌বৈদগ্ধ বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ সরল, ভাবপ্রধান গ্রাম্য শ্রোতৃবৃন্দের যে উপায়ে চিত্তরঞ্জন করা যায়, চতুর সুশিক্ষিত নাগরিকবর্গের মন আকর্ষণ করিতে তদপেক্ষা ভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন হয়। রাজা ও সভাসদেরা কবির নিকট প্রত্যাশা করেন সরল মর্মস্পর্শী আবেগের পরিবর্তে চমকপ্রদ তীক্ষ্ণাগ্র উক্তি-পরম্পরা, সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ বেশে সাজাইবার কৌশল, শব্দ-বিন্যাস ও উপমানির্বাচনের বিশেষ পারিপাট্য। বিদ্যাপতির কবিতায় পূর্ণমাত্রায় রাজপ্রতিবেশপ্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার পদাবলী স্মরণীয় প্রবাদবাক্য, সুভাষিতসংগ্রহ ও প্রণয়কলাচাতুরীর অভিজ্ঞতার নিদর্শনে পূর্ণ। সময় সময় মনে হয় যে গভীর ভাবোদ্রেক অপেক্ষা এই সমস্ত শাণিত উক্তিবিন্যাসেই লেখক সমধিক আগ্রহশীল। তাঁহার অনেকগুলি পদ আগাগোড়া প্রবাদসমষ্টি। এগুলিতে বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুশীলনে ভাবমাধুর্য, এমন কি ভাবসংহতি ক্ষুণ্ন হইয়াছে। আর এই প্রবাদগুলির

অধিকাংশই যে বাংলাদেশের জলমাটিতে জন্মে নাই, বাঙালীর মস্তিষ্কে দানা বাঁধে নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এগুলির উপর বিহার অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সেখান হইতে আহরিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষিত হয়। লেখক তাঁহার ভাবপ্রকাশের জন্য এমন অনেক উপমা নির্বাচন করিয়াছেন যাহা বাঙালী কবির মনে কখনই উদয় হইত না এবং যাহা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার সাধারণ কোষাগার সংস্কৃত কাব্য অলংকার হইতেও সংগৃহীত নহে। সুতরাং তাঁহার ভাষা ছাড়াও এই উপমাবৈশিষ্ট্যের দ্বারাও তাঁহার অবাঙালীত্ব প্রমাণিত হয়। সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে বিদ্যাপতির রচনারীতি ও মানসভঙ্গী রাজসভার রুচি ও তাগিদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের আদি পুরুষ। অবশ্য ভারতচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার কল্পনাশক্তি ও ভাবগভীরতা অনেক বেশী ছিল। তথাপি উভয়ে যেন এক গোষ্ঠিভুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির পদে হীরামালিনীর পূর্বপুরুষস্থানীয়া কুট্টিনীর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কবি রাধাকৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা উপলক্ষে যে রাজপরিবারের দাম্পত্যপ্রেমের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন ও রাজদম্পতির উপর রাধাকৃষ্ণের গৌরবের কিয়দংশ আরোপে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের নামের পুনঃপুনঃ সসম্ভ্রম উল্লেখে পরিস্ফুট।

অবশ্য প্রণয়লীলা সম্বন্ধে এই পরিপক্ব অভিজ্ঞতার নিদর্শন যে কেবল বিদ্যাপতিরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে—সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাতেই ইহা একটা সাধারণ সুর। বৈষ্ণব কবি যখন প্রেমবর্ণনায় ভক্তিবিহ্বল তখনও তিনি কামশাস্ত্র ও রসবিদগ্ধ সমাজজীবনের শিক্ষা বিস্মৃত হন নাই। এই পাকা ওস্তাদি সুর বহুশতাব্দী ধরিয়া অনুশীলিত সংস্কৃত প্রেমকবিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব কবিতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। পদাবলীতে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রসিকের বিশেষজ্ঞতার সমন্বয় হইয়াছে। রাধিকা কখনই সরলা অনভিজ্ঞা নায়িকারূপে প্রদর্শিত হন নাই। বয়ঃসন্ধির পদগুলিতে কিশোরীর মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত

প্রথম প্রণয়োন্মেষের চমৎকার চিত্র অংকিত হইয়াছে সত্য; প্রথম অভিসার সময়ে নায়কের ব্যগ্র, আলিংগনোদ্যত বাহুপাশের নিকট নায়িকার সংকুচিত প্রণয়ভীরুতাও কয়েকটি পদে উপভোগ্যভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহাও ঠিক। আবার নায়িকার দুঃসহ বিরহ বেদনা ও ভাবময়তার বর্ণনাতেও পদাবলী সাহিত্য প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও সর্বথা স্বীকার্য।

তথাপি মোটের উপর নায়কনায়িকার অভিসার-মিলনসম্ভোগ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের রসাস্বাদনে অনুশীলিত রুচিবৈদগ্ধ্যেরই পরিচয় মিলে। আর এই প্রণয়লীলা সখীর মধ্যবর্তিতায় সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া যেমন একদিকে ইহাতে নাটকীয় গুণ ও স্নিগ্ধ রসমাধুর্যের স্ফুরণ, তেমনি অন্যদিকে পরিণত কলাকৌশল ও শিষ্টরীতিপ্রয়োগেরও অনুবর্তন হইয়াছে। কেননা সখীরা প্রণয়ব্যাপারনিপুণা। প্রেমের বিসর্পিল গতির প্রত্যেকটি বংকিম রেখার সহিত পরিচিতা। তাহাদের বিশেষজ্ঞতা নায়িকার অনভিজ্ঞ সারল্যের ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহার প্রেমকে নাগরালির বহুপদাংকিত রাজপথ দিয়া অগ্রসর করিতে বাধ্য করিয়াছে। তারপর এই অপরূপ প্রেমলীলার সর্বশেষ অধ্যায়ে এক বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে। মাথুর প্রবাসের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক প্রধান সর্বগ্রাসী তরঙ্গ আসিয়া সখীদের এই যত্নরচিত ব্যবস্থাকে, এই পার্থিব প্রেমের ছদ্ম অভিনয়কে কোন অতলে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন একদিকে রাধিকার অতলস্পর্শ, অপ্রমেয় বেদনা, অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণের নিয়তির মত নিষ্ঠুর নিশ্চলতা। উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্তিতার আর কোন অবকাশ নাই। সখীদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অবশ্য তাহারা মাঝে মাঝে মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে যাতায়াত করিয়া বিস্মৃতিশীল নায়ককে শ্লেষপূর্ণ ভর্ৎসনা ও নায়িকার দুঃসহ ব্যথার কথা শোনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দৌত্য হংস পবন প্রভৃতি মনুষ্যেতর বাহনের দৌত্যের ন্যায় নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই সান্ত্বনাহীন বিরহ বেদনা, এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি,

এই চিরন্তন ব্যাকুলতা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের জন্য আধ্যাত্মিকতার অক্ষয় স্বর্গ রচনা করিয়াছে।

প্রণয়ের আস্বাদনে বিদগ্ধরুচির পরিচয় বৈষ্ণব কবিতার সাধারণ সুর হইলেও এ বিষয়ে বিদ্যাপতির কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা ও কৃষ্ণের বাগবিতণ্ডার অনুরূপ শ্লেষোক্তিবিন্যাস ও প্রবাদবাক্য সংকলনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এই কথাকাটাকাটির মধ্যে লেখকের নৈসর্গিক প্রতিভা বাদ দিলে স্থূল অমার্জিত রুচিরই, গ্রাম্য আতিশয্যেরই পরিচয় মিলে। ইহাতে সরল খোলাখুলি, শ্লীলতার অনুশাসনলংঘী কথাবার্তার দ্বারাই কলহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এখানে রাজসভাসুলভ পরোক্ষ ইঙ্গিত ও বঙ্কিম কটাক্ষের সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যের বালাই নাই। আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি না যে বড়ু চণ্ডীদাসের শাণিত উক্তিগুলি কোন অভিজাত ছদ্মবেশী শিষ্টাচার রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে রাধিকা ও সখী সম্প্রদায়ের মুখে কৃষ্ণের প্রতি যে ভর্ৎসনা শুনা যায়, তাহা ভিন্নজাতীয়। অবশ্য এই কপট কলহে নায়কের কোন পালটা জবাব দিবার চেষ্টা নাই, আছে কেবল বিনীত আত্মদোষক্ষালন বা কাতর প্রসাদভিক্ষা। শঠ, লম্পট, শতঘরিয়া প্রভৃতি গালিগুলি মার্জিত অমার্জিত রুচির ধার ধারে না। এগুলির ভিতর দিয়া যেন সোহাগের মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজ কবির ভাষায় ইহা সেই ধরণের মিষ্ট ভর্ৎসনা যাহা শুনিবার জন্য দোষের পুনরভিনয়ের প্রলোভন জাগে। বিদ্যাপতির পদে অনুরূপ উক্তিগুলির মধ্যে বড়ুর গ্রাম্য সরলতা বা পরবর্তী বৈষ্ণব কবির স্নেহ-বিগলিত সুরটি ঠিক শোনা যায় না। মনে হয় যেন রাজসভার সংসর্গ প্রভাবেই বিদ্যাপতির প্রেমবর্ণনায় ও নায়কের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগে স্থানে স্থানে সাংসারিক বহুদর্শিতার ছাপটি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইতে পারা যায়।

(১) আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে জয়দেব যে শৃঙ্গাররসপ্রধান মাধুর্যের বন্যা বহাইয়া দিলেন বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে তাহারই ধারা সরসতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির জীবনে ও কাব্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

(ক) ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার মতবাদ কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা—তাঁহার ভক্তিপরায়ণতা কেবলমাত্র রাধা-কৃষ্ণের উপাসনার পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই।

(খ) তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাব্যরচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় অনেক বেশী ছিল—তাঁহার কীর্তিলতায় আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের চমৎকার কবিত্বপূর্ণ, অথচ বাস্তবরসসমৃদ্ধ বিবরণ পাই।

(গ) মিথিলার রাজসভার সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তিনি যে মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, সুনিপুণ বাকভংগী ও শিল্পচাতুর্য এবং প্রেম সম্বন্ধে বহুদর্শী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা দোষেগুণে তাঁহার পদাবলী রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রেমের আলোচনায় বড়ু চণ্ডীদাস ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠির সহিত তাঁহার সুরের বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥ কবি বিদ্যাপতি ; (বিশ্বভারতী, ১৩৫৯)

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ্ম কবি। কিন্তু কবি প্রতিভার স্বরূপবিচারে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য কিছু কম নয়। চণ্ডীদাসকে বলা যায় খাঁটি গীতিকবি, আর বিদ্যাপতির গীতিপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় কলাকৌশলবোধ। এই নাট্যধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতির রাধিকা অল্পে অল্পে

মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে সেখানেই বিদ্যাপতির নাট্যশিল্পপ্রবণতার প্রতি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আত্মনিষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানা ভঙ্গীতে নানা আবেগে আস্বাদন যদি গীতিকবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয় চণ্ডীদাসকে তাহা হইলে খাঁটি গীতিকবি বলা যায়। আর বস্তুনিষ্ঠতা ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ বা বিবর্তনই যদি নাট্যকলাকৌশলের মূল কথা হয় বিদ্যাপতির পদাবলীকে তাহা হইলে গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। আত্মনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সাহিত্যের দুইটি বিশেষ ভঙ্গী। আত্মনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে বিষয়ী; বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়ী গৌণ, বিষয়ই মুখ্য। প্রথমটির সার্থক উদাহরণ গীতিকবিতা, দ্বিতীয়টির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য। চণ্ডীদাসের আত্মনিষ্ঠতা এবং বিদ্যাপতির বস্তুনিষ্ঠতা, চণ্ডীদাসের গীতি-প্রবণতা এবং বিদ্যাপতির নাট্যকলাকৌশলবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন রহিয়াছে উভয়ের রাধিকা চরিত্র পরিকল্পনায়।

কবি চণ্ডীদাস নিজে এবং চণ্ডীদাসের রাধিকা মূলতঃ অভিন্ন। স্রষ্টা আর সৃষ্টি সেখানে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর চণ্ডীদাসের কৃষ্ণসেবাবাসনার ব্যাকুল আবেগ রাধিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকা তাই কবিরই মানস প্রতিফলন। এ রাধিকা বৈষ্ণবী প্রেমের Symbol; তিনি বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাব স্বরূপিণী, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। ইনি অশরীরী ভাববিগ্রহ বলিয়া ইহার চরিত্রের কোন পরিবতন বা বিবর্তন নাই। চণ্ডীদাস অবশ্য ইহাকে নানা অবস্থায় কল্পনা করিয়া নানা ভঙ্গীতে ইহার লীলা আস্বাদন করিয়াছেন। তবু পূর্বরাগের রাধিকা, মিলনের রাধিকা, আর বিরহের রাধিকা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। ইহার অবস্থা পরিবর্তন জলের আধার পরিবর্তনের অনুরূপ। আমরা আদিতে তাঁহাকে যেভাবে দেখি পরিণতিতে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবেই দেখি। তাঁহার পূর্বরাগ উচ্ছ্বাসহীন

মিলনও উল্লাসহীন। তাঁহার পূর্বরাগ মিলন অভিসারের উপর বিরহের কালোছায়া প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে পরম বিষাদময়ী করিয়া তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিণী বিষাদপ্রতিমা। তাই প্রথম পূর্বরাগের সময় দেখি—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥

পূর্বরাগের প্রথম পর্বেই রাধিকার যে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ পর্যন্ত সেই ক্রন্দনের জের চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকার কেন্দ্রস্থ ভাবটি এই—যাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাই মানস সাগরের অগম তীরে তাঁহার বাস, তাঁহার সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া? তাই রাধিকা 'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নতারা।' এ প্রেমে যে আর্তি তাহা তো মিলনেও মিটিবেনা, উভয়ের মধ্যে যে চিরবিরহের অশ্রুলবণাম্বুরাশি উদ্বেল, ক্ষণিক মিলন তাহার উপর সেতু রচনা করিবে কেমন করিয়া? তাই 'দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। চণ্ডীদাসের রাধিকা এই ভাবেরই বিগ্রহ।

বিদ্যাপতির রাধিকা কোনো বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাঁহার চরিত্র আছে। তিনি রূপৈশ্বর্যে মূর্তিমতী। তিনি কবির মানস প্রতিফলন নন, কবি তাঁহাকে দূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার শুধু পরিণতিটুকুই আছে। বিদ্যাপতির রাধিকার সূচনাও আছে, পরিণতিও আছে, এবং সূচনা হইতে পরিণতি পর্যন্ত সেই চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানাস্তর আছে। এইখানেই বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। পরিণতিতে বিদ্যাপতির রাধিকাও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত,

নানা মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা, নানা অশ্রুহাসির দোলা। বয়ঃসন্ধিতে যে রাধিকা 'মেঘমালা সঁয় তড়িতলতা জনি', যাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'গেলি কামিনী গজহুগামিনী,' সেই বিদ্যুল্লেখা সম চঞ্চল সৌন্দর্য প্রতিমাকে পরিশেষে দেখিলাম 'মলিন কুসুম তনু চীরে, করতল কমল ঢর নীরে।' বিদ্যাপতি কুশলী নাট্যকারের মত তাঁহার রাধিকাকে ক্রমশঃ এই পরিণতির পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই রাধিকার বাহিরের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসিয়াছে। বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধিকা চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার মানসবিকাশের সূক্ষ্মস্তরগুলি স্পষ্ট ধরা পড়িবে। এদিক দিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহখণ্ডে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার অশ্রুপ্লাবনে 'কালিনী নই' কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল দানখণ্ড বাণখণ্ডের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা এবং বিদ্যাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের রাধিকার সেখানে শুরু।

বিমান বিহারী মজুমদার॥ বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৬৩)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, যাঁহার জীবনকাহিনী আমাদের নিকট সুপরিচিত। কাজেই সেকালের কোন কবির রচনাশৈলীর অথবা মানসিক ক্রম-বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ কচিৎ পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির কোন প্রামাণ্য বা সমসাময়িক জীবনী নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বহু সংখ্যক গ্রন্থে ও পদে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা রানী কুমার ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। সেইগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লেখনী

পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি অন্ততঃ এগারোজন রাজা রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০১) নয়জন মিথিলার ওইনীবার বা কামেশ্বর বংশের রাজা এবং একজন নেপাল তরাইস্থিত সপ্তরি জনপদের ভূপতি। বিদ্যাপতি প্রথমে ভোগীশ্বরের পৌত্র কীর্তিসিংহের সময় কীর্তিলতা লেখেন, কি ভোগীশ্বরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহের সময় 'ভূপরিক্রমা' রচনা করেন, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু দেবসিংহের দুই পুত্র শিবসিংহ ও পদ্মসিংহকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জুন সিংহকে যে কবি পদ উৎসর্গ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম পীঠিতে দেবসিংহ, দ্বিতীয় পীঠিতে কীর্তিসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও অর্জুনসিংহ এবং তৃতীয় পীঠিতে ধীরসিংহকে দেখা যায়। আর যে রাঘবসিংহকে ১১৫-২১৭ সংখ্যক পদ উৎসর্গ করা হইয়াছে তিনি বীরসিংহের পিতৃব্য রাঘব না হইয়া ধীরসিংহের পুত্র রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বর বংশের চার পুরুষের লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যাপতি কবিতা লিখিয়াছেন প্রমাণ পাওয়া যায়।

জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্বে আর্সলানের হাত হইতে ত্রিহুত উদ্ধার করিয়া কীর্তিসিংহকে সামন্ত রাজপদে অভিষিক্ত করেন। 'কীর্তিলতা' কীর্তিসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ে লেখা। সেই সময় বিদ্যাপতির বয়স অন্তত ২০।২২ বৎসর হইয়াছিল।...কবি কীর্তিলতায় কীর্তিসিংহের সিংহাসন লাভের পূর্বের মিথিলার দুঃখ দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই দুর্দিনে তাঁহার কবিত্বের প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যাসদীন নামাঙ্কিত কবিতাটিতে রহিয়াছে। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম ধরিলে, ঐ কবিতাটি লেখার সময় তাহার বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল।

বিদ্যাপতি কীর্তিসিংহের রাজ্যারম্ভ হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পর্যন্ত ১২।১৩ বৎসর কাল মিথিলার রাজসভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অন্তরঙ্গ সুহৃদরূপে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তারপর কবির জীবনে দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। শিবসিংহের মৃত্যু বা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের তিন চারি বৎসর পরে ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি কবি দ্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্বাদিত্যের পুত্র পুরাদিত্য গিরি নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় "লিখনাবলী" রচনা করিতেছেন।

পুরাদিত্যের রাজধানী ছিল জনকপুরের নিকটবর্তী রাজবনৌলিতে। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যাপতি এই রাজবনৌলিতে জীবন যাপন করেন; কেননা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে তিনি ৩০৯ লক্ষ্মণ সংবৎ বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবনৌলিতে বসিয়া ঐ গ্রন্থ নকল করেন। ঐ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর।

৩৭।৩৮ হইতে ৪৭।৪৮ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাপতি উনীবার রাজবংশের রাজধানী হইতে দূরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময় দুঃখ কষ্টের মধ্যেই তাঁহার মনের ধারা পরিবর্তিত হয় বলিয়া আমার অনুমান। এই অনুমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্কিত পদগুলির ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও রসোপলব্ধির সহিত রাজ-নাম-বিহীন অধিকাংশ পদের ভাব ও ভাষার পার্থক্যে।

দেবসিংহ-নামাঙ্কিত পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুন নামাঙ্কিত পদ পর্যন্ত ২১১টি কবিতা বিদ্যাপতির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা ইহা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। এই ২১১টি পদের ভাব ও ভাষার সহিত যে সব রাজনামবিহীন পদের ভাষার ও ভাবের মিল আছে, সেগুলি কবির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।.... বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৮০ বৎসর হইয়াছিল তখনও অধ্যাপনা করিতেছেন।.... রবীন্দ্রনাথের ন্যায়

অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বিদ্যাপতি কবিতা লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই তাঁহার ৬০৭ সংখ্যক পদে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—"আজ চুল কেমন সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্যামল বন শুকাইয়া ত্বকবিহীন সাদা কাঠ হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ম্লান, কানে শুনিতে পাই না, দেহের আঁট সাঁট ভাব শুকাইয়াছে। যে মুখ দাঁতে ভরা ছিল সে এখন কামানো সাপের মতো দাঁতবিহীন হইয়াছে; তাই থো থো করিয়া কথা বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই মনে মনে ভুবন ভ্রমণ করি; বেড়াইবার ক্ষমতা নাই, অথচ বাসনা আছে—আমার সমস্ত দাপট ঝরিয়া গিয়াছে। যাহার জন্য ঘর দুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি —সে সবই অসার। আঁখিপাখী দুটি সবই বিকার জানিয়া শ্রান্ত হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িল।"

নিজের জরার উল্লেখ কবির আরও দুইটি পদে দেখা যায়। ৭৬৩ সংখ্যক পদে আছে—

আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা।

৭৬৪ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন—

"সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার মতি যুবতী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল; আমি অমৃত ছাড়িয়া হলাহল পান করিলাম; আমার সম্পদই আমার কাল হইল। আজ জীবনসন্ধ্যায় ভাবিতেছি যে, কথার উপর কথা সাজাইয়া কি কাজ করিলাম? এখন এই জীবনের শেষবেলায় তোমার সেবা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তোমার চরণের দিকে চাহিতেও লজ্জাবোধ হইতেছে।" কবির মানসিক ক্রমবিকাশের মূলসূত্র এই তিনটি পদের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস।

কবির যে সমস্ত পদ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাল হিসাবে প্রথম দুটি পদই লখিমা অসতী বিষয়ক। কবি একটি উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন সুরতানকে, অপরটি তাঁহার বন্ধু শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে। উভয় কবিতাতেই নায়িকার কেশপাশ, নয়ন ও ও পয়োধরে রতিসম্ভোগচিহ্নের কথা আছে; কিন্তু গ্যাসদীন নামাঙ্কিত কবিতাটিতে শুধু দেহেরই বর্ণনা; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন ইঙ্গিত নাই। আর দেবসিংহ নামাঙ্কিত কবিতায় দেহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র মনের ভাবের অভিব্যক্তির জন্য। স্বল্পাক্ষরে বহুল ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষার দ্বারা অলঙ্কৃত না করিয়া কোন কথা না বলা, এই দুইটিই বিদ্যাপতির রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে।....

বিদ্যাপতি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন; সেইজন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। বিদ্যাপতি প্রথমজীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনের সহজ ভাবকে রসঘন, ব্যঞ্জনাময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিবসিংহাদি নামাঙ্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে যেভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সহিত রাজনামবিহীন পরিণত বয়সের লেখা প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন, বিরহিণী বর্ণনা এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির মনের ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশের ধারা বুঝা যায়।....

শিবসিংহের সভাকবিরূপে বিদ্যাপতি প্রেমের দৈহিক দিকটাই বেশী করিয়া দেখিয়াছেন।.... বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে

দেহাতীত প্রেমের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবেদনাতেও প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে কবিতার উপজীব্য করিলেও শেষ জীবনে মধুরোজ্জ্বল করুণ রসের উর্মিমালা অতিক্রম করিয়া অদ্বৈত ভাবানুভূতিতে পৌঁছাইয়াছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ; ১৩৬৭

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কথাগুলি নিন্দার না প্রশংসার, যদি ঐ প্রেম হয় লৌকিক এবং সৌন্দর্য পার্থিব ? লৌকিক প্রেম ও পার্থিব সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো কবির পক্ষেই অগৌরবের অধিকার নয়। বিদ্যাপতির পক্ষেও নয়।.... মর্ত্যপ্রেম ও মর্ত্য সৌন্দর্যের রূপকার রূপেই বিদ্যাপতির মর্যাদা। কখনো কখনো অবশ্য আকাশের আলো আসিয়া মর্ত্য-দেহের শিরশ্চুম্বন করিয়াছে, কখনো বা দেহের রক্তমাংসের ভিতরে অপরিজ্ঞাত চেতনা নূতন জাগরণে শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে শিব-শিরের চন্দ্রকান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—তখন বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছেন ; কিন্তু সে জীবনের বিরল ক্ষণেই বটে। তার পূর্বে বিদ্যাপতি দেহবাদী।

ভারতবর্ষে বিদ্যাপতি কোনো বিস্ময় নন। প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার স্বাভাবিক সার্থক এক পরিণতি তাঁহার মধ্যে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেমকাব্যের ঐতিহ্যের মহৎ উত্তরাধিকারী তিনি। রূপধারণায় এবং ভাবপরিবেশনে তিনি অমৌলিক। তিনি প্রশস্ত কবিপথগামী। তিনি পুরাতন। সেই তাঁহার নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির উত্তরাধিকার।...

তথাপি শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতি কি রূপ ও রসকে চরম সম্মান দিয়াছেন ? কোথায় ? অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের পণ্ডিত কবির বার্ধক্যের ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে,

কত বিদগধ জন 'রস' অনুমগন

আনুভব কাহু না পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলল এক॥

বিদ্যাপতি কাঁদিতেছেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন সব মিথ্যা। জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা। সৌন্দর্য? তাহাও মিথ্যা। এত যে সৌন্দর্য-সাধনা, এর শেষ কোথায়? সকল হিন্দুর মত (বৈষ্ণব বাদে) বিদ্যাপতি উত্তর দিয়াছেন,—শ্মশানে, যে শ্মশানে শ্মশানেশ্বর, ভুবনেশ্বর আছেন। সেখানে মাধবও আছেন। জীবনের নশ্বরতার চিন্তা যৌবনের ভোগ লগ্নেও বিদ্যাপতির মনে আসিয়াছিল। সেদিন যৌবন যে নশ্বর—এই অভিজ্ঞতাবুদ্ধি দ্রুত যৌবন-সুখ গ্রহণে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। জীবনের শেষকালে আসিয়া দেখিলেন, সৌন্দর্য সত্যই নশ্বর। উপভোগের আনন্দে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। "সন্ধ্যাবেলায় ভিক্ষা মাগিবার লজ্জায়" আতুর বিদ্যাপতি শ্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।

তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়

অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥

আর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন অপূর্ব অভেদ ভালবাসার, যে ভালোবাসা রাধাকৃষ্ণের—

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।

বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

চণ্ডীদাস

॥ কানুরাম দাস ॥ চণ্ডীদাস বন্দনা।

কবিকুলে রবি   চণ্ডীদাস কবি
          ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক   প্রেমিকে প্রেমিক
          সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব   ভাষার লালিত্য
          ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে   মুখে ভাষা ফুটে
          উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল   রচনা প্রাঞ্জল
          প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কানে   সেই লাগে প্রাণে
          শুনামাত্র আত্মহারা ॥
রামতারা ধনী   রাধাস্বরূপিণী
          ইষ্টবস্তু যাঁর হয়।
যাহার দরশে   চণ্ডী রসে ভাসে
          কবিতার স্রোত বয় ॥
হয় নাই হেন   না হইবে পুনঃ
          হেন রস-পদ ভবে।
দীন কানু দাসে   মাথ পদ পাশে
          নামের ঘোষণা রবে ॥

রামগতি ন্যায়রত্ন। চণ্ডীদাস। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১২৮০)

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। ঐ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্য দেবতা বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী ; অপভাষায় 'বাশুলী' বলে। প্রবাদ আছে চণ্ডীদাস প্রথমে ইহার উপাসনা করিতেন, পরে ইহারই আদেশে কৃষ্ণ-পরায়ণ হন, এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানা পদাবলী রচনা করেন।

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির জন্ম যদি ন্যূনাধিক ১৩০০ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ১০৭ বৎসর পূর্বে হইয়া থাকে, তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাঁহার কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক-পত্নী, প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে রকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলিতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য ও রচনা পারিপাট্য অধিক আছে, চণ্ডীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় না। ইঁহার রচনা সাদাসিধা সামান্য ভাব লইয়াই অধিকাংশ গীত রচিত। সকল গীতই মধুর ও হৃদয়স্পর্শী। যতই পাঠ করা যায় ততই পড়িবার ইচ্ছা বাড়িতে থাকে। সুর লয়ে গীত হইলে শ্রোতা তন্ময় হইয়া পড়ে। কতকগুলি গীতে নিতান্ত আদিরস সংযুক্ত বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে রুচিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইলেও বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত অন্তঃদৃশ্য অতি প্রীতিকর বোধ হইবে। চণ্ডীদাস যে সময়ের লোক সে সময়ে ঐরূপ সুললিত ছন্দোবদ্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ

করিবার অধিক অবসর পান নাই, যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নৈসর্গিক-শক্তি-সম্ভূত।

যে দিক হইতে দেখা যাউক না, চণ্ডীদাসকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি। (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮)

আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এইগুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।....

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। চণ্ডিদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।....

চণ্ডিদাসের রাধাশ্যামের যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। কিছুতেই তৃপ্তি নাই।....

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডিদাস জগতের

চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক। ইহা আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই। তথাপি বাড়িতেছে।

নিত্যই নূতন পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি খায়!

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডিদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবিতায় পাওয়া যায়? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে।

সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু চণ্ডিদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।

চণ্ডিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন—"কামগন্ধ নাহি তায়!" আর এক স্থলে চণ্ডিদাস কহিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।—
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ

প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন—স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম আর কিছুই নহে। যেকালে চণ্ডিদাস ইহা লিখিয়াছিলেন ইহা সেকালের কথা নহে।

দীনেশচন্দ্র সেন ॥ চণ্ডীদাস। (ভারতী, চৈত্র ১৩১১)

উপমা, শব্দযোজনা পদলালিত্য প্রভৃতি নানা উপায়ে কবি আমাদিগের মন হরণ করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ফুল্লকুসুমের ন্যায় স্বীয় স্বর্গীয় নিঃশ্বাসে সুরভি ও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাব্যে উপমা, সহজ কথায় পরিব্যক্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির ক্ষেত্র হইতে সংকলিত। তাঁহাদের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বা স্বরের বিচিত্র লাস্য হইতে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্ম, কিন্তু যখন তাঁহাদের প্রণালী মুগ্ধ চক্ষে দেখিয়া আলঙ্কারিকগণ নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তখন নিম্নশ্রেণীর কবি-গণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম কল্পনায় জড়িত হইয়া স্বভাবকে বিকৃতিতে পরিণত করিয়া ফেলেন। রমণীর সিন্দূর বিন্দুর উপর একগাছি কেশ ঝুলিয়া পড়িতেছে, কবি বলিলেন—রাহু দৈত্য বদন ব্যাদান করিয়া চন্দ্রকে গিলিবার প্রয়াস পাইতেছে, ক্ষীণ কটি স্ত্রীলোকের পক্ষে শোভন, কবি বলিলেন—উহা মুষ্টির মধ্যে ধরা যায় কিংবা কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। নিম্ন-শ্রেণীর কবিগণ স্বভাবের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি না রাখিয়া—অলঙ্কারশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া বিকৃত হইয়া পড়েন। বিদ্যা যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধটি স্বীকার করে, তখন বিদ্যায় বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধ ছাড়িয়া যখন বিদ্যা কল্পনা আশ্রয় করিয়া বায়ব লতার ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়—তখন উহাতে বুদ্ধি শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। গানে কতকটা নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহা সংযত ও সুন্দর হয়, কারণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়মের মধ্যেই আপনাকে ধরা দেয়; কিন্তু যখন সৌন্দর্যজ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া নিয়মগুলিই আদেশ হইয়া উঠে, তখন অরাজকতা উপস্থিত হয়। কারণ

প্রকৃতিই সর্বদা সম্রাজ্ঞী, তৎস্থানে কল্পিত নিয়মাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে তাহা কথনই পূজার্হ হইতে পারে না; এজন্য অতিরিক্ত কল্পনাপ্রয়াসী কবি ও স্বরের সূক্ষ্ম তাৎপর্যের অতিরিক্ত অনুরাগী কলাবিদ, কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণমুগ্ধকর চিত্রকর—মাত্রা হারাইয়া বসে, তাহারা সৌন্দর্যের নামে কদর্যতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। শিক্ষাস্পর্ধিত প্রাজ্ঞ মানী সম্প্রদায়ের অন্ধদৃষ্টিতে কোন কোন যুগে এই সকল কাঁচ কাঞ্চনের মূল্যে বিকাইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণের উপমা সহজ,—তাঁহাদের কথাগুলি প্রকৃতির সৌন্দর্যতত্ত্বকে সরল রেখাপাতে লোকের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। তাহাদের কণ্ঠের স্বর মিষ্টত্বে বিচিত্র ঝঙ্কারে মর্মস্পর্শ করে এবং রচনানৈপুণ্যে অলঙ্কারগুলি স্বভাবের শোভার অনুকরণ করে। কালিদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের কথাগুলিতে জগতের বিচিত্র রূপ রস গন্ধ সমুদ্রের মত স্বীয় ভাণ্ডার উদঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাঁহাদের ছন্দ কথার ঝঙ্কার, উপমার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্যানুভূতির প্রগাঢ়তা,—প্রভৃতি বিচিত্র গুণ প্লাবনের মত আমাদিগকে মোহাবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু কাব্যের আর এক গ্রাম আছে, তাহা সকল লোকের চক্ষে আপনার সত্তা প্রকাশ করেনা; তাহা গূঢ়-স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। তাহা এত অনাড়ম্বর যে তাহার সমৃদ্ধিকে লোকে দৈন্য বলিয়া ভুল করিতে পারে, তাহা এত স্বল্পভাষী যে, লোকে অন্যত্র ছন্দের ঝঙ্কার শুনিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহা এত সহজ সরল ও প্রাকৃত কথার কতকটা প্রকাশ্যভাবে, কতকটা ইঙ্গিতে নিজের পরিচয় দেয় যে, তাহাকে লোকে অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর—এমন কি ভদ্রসাহিত্য হইতে দূরে রাখিবার যোগ্য মনে করিতে পারে,—কবিতার এই গ্রামে অবস্থিত মহাজন নিজের উপস্থিতিকে গুরুতররূপে উপলব্ধ করাইবার কোন সাজসজ্জা প্রদর্শন করেন না,—তিনি আদৌ পরকে অভিভূত বা বিস্ময়াবিষ্ট করিবার চেষ্টা পান না, তাঁহার প্রতিভা বিদ্যুতের মত

চক্ষু ধাঁধিয়া দেয় না, তিনি শুধু দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট ধরা দেন,—অপরের নিকট এমন কি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নিকটও তিনি কতক পরিমাণে অপরিজ্ঞাত, ও ম্লান হইয়া থাকেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের এইস্থানে প্রভেদ, বিদ্যাপতি রাজকবি,—উজ্জ্বল বেশভূষা, বিচিত্র উপমার ঝঙ্কার, অর্থসম্পদ লইয়া রাজসম্মান চিহ্নিত প্রতিভাপরিদীপ্ত ললাটে নবজয়দেব আখ্যা ধারণ করিয়া তিনি সভাবিজয় করিতেছেন। তাঁহার কথাগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের আদর্শ—ছন্দের ঝঙ্কারে ও শব্দচ্ছটায় যে মোহিনীর সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে পণ্ডিতকুল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রেমিক কিন্তু আড়ম্বরপূর্ণ, তাঁহার প্রতিভা রত্নাম্বর পরিহিতা, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও বাক্‌চাতুর্যে রাজসভায় মনোরঞ্জনী,—ইহার পার্শ্বে চণ্ডীদাসকে দেখুন, কথায় ছন্দ নাই, কচিৎ উপমা আছে কি নাই, বটতলায় নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু যেখানে প্রেম গভীরতম, সেখানে প্রেম লুকাইবার চেষ্টা স্বাভাবিক, যেখানে ব্যথা ও সুখ হৃদয়ের অভ্যন্তরে, সেখানে বাহ্য শোভার প্রতি উপেক্ষা স্বাভাবিক। মাতা যেমন সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কথা বলেন না, তাঁহার জীবন আকার ইঙ্গিতে সেই বাক্যহীন ভালবাসাকে জীবন্ত করিয়া দেখায় মাত্র, চণ্ডীদাসের অল্প কথা সেইরূপ গভীরতম প্রেমকে আভাসে দেখাইতেছে,—সাহিত্য ও কাব্যের সৌন্দর্য যতই পরিপূর্ণ আনন্দের সন্নিহিত হয়, ততই তাহাদের ভাষা স্বল্প হইয়া পড়ে, অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া উপনিষদের নিকটে গেলে উপনিষদের অমর্যাদা হয়, কারণ কবির কবিকাব্যের কাব্যে—যেখানে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন সেখানে সাহিত্য প্রণিপাত মাত্র করিবার সম্মান দাবি করিতে পারে. নিয়ম বাঁধিয়া বিচার সেখানে চলে না।

চণ্ডীদাস রামীর প্রতি প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া কহিয়াছেন, "তুমি হও পিতৃমাতৃ"—প্রণয়িনীকে পিতা এবং মাতার স্থলে অভিষিক্ত করা হয়ত বাতুলতা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রেম সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছে, সেখানে পিতা মাতা পতি পত্নী ও সখার

প্রেম মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে আর স্বতন্ত্র করিয়া, এবং বিচিত্র অধিকার লইয়া সীমাবদ্ধভাবে উহাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, সেখানে প্রেম সমুদ্রের মত—পিতৃমাতৃস্নেহ, সখ্যভাব ও দাম্পত্য সেস্থানে এক হইয়া নাম হারাইয়া মিশিয়া গিয়াছে, এই কথাটি চণ্ডীদাস বুঝিয়া ছিলেন। প্রাচীন রামায়ণে দশরথ কৌশল্যাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন তিনি আমাকে মাতৃবৎ সখীবৎ ও দাসীবৎ সেবা করিয়া থাকেন,—তারপর সেই কথাটি অনেক কবি নকল করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস রামীকে যখন বলিয়াছেন, "তুমি হও পিতৃমাতৃ"—তখন তিনি প্রাচীন সত্যটি ধার করিয়া গ্রহণ করেন নাই,—সত্যটি তাঁহার মনে নূতনরূপে উদয় হইয়া নূতন ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণ, দেবমন্দিরের পূজারী আর তদপেক্ষা বহুব্যবধানে-স্থিত রামী ধোপানী,—তাহার পদে একি পুষ্পাঞ্জলি! কোন্ ব্রাহ্মণ এখনও—যখন সামাজিক বৈষম্য অনেকটা লোপ পাওয়ার মধ্যে—এখনও কোন্ ব্রাহ্মণ এইরূপ অসম প্রেমের কথা নির্ভীকভাবে এরূপ দর্পে বলিতে পারে—"তুমি রজকিনী আমার ঘরনী, তুমি হও পিতৃমাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী"; বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি যে কয়েকটি ভাব নির্দিষ্ট আছে—চণ্ডীদাস রামীর প্রেমের মধ্যে তাহার সমস্তগুলি অলক্ষিতভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি শাস্ত্র পড়িয়া বৈষ্ণব হন নাই, প্রকৃতি তাঁহাকে মহাবৈষ্ণব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তারপর রাধিকার প্রেম বর্ণনায় তিনি যে সাত্ত্বিক ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা স্বল্পরেখাপাতে যে স্বর্গীয় রূপের আভাস দিতেছে, তাহার আদর্শ তিনি কোথায় পাইলেন? তাহা আমরা বিস্ময়ের সহিত বিতর্ক করি।

রাধার পূর্বরাগে আছে—"বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমত যোগিনী পারা।" রাধা ত সর্বদাই নীলাম্বর পরিহিতা, এ রাঙ্গাবাস বা গেরুয়া বস্ত্রের কথা ও উপবাসের কথা চণ্ডীদাস কোথায় পাইলেন? —

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা" চৈতন্য প্রভুর গুরুস্থানীয় মাধবেন্দ্রপুরীর বর্ণনায় আছে—"মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন, মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন।" ধ্যানময়ী রাধার মেঘদর্শনে যে ভ্রান্তির কথা এখানে সূচিত হইয়াছে, তাহা উত্তরকালে রাধার দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বর্ণনায় বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অসংখ্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে,—মেঘদর্শনে, তমালদর্শনে, কোকিলকূজনে নানারূপ ভ্রান্তি বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ অধ্যায়কে উদ্‌ভ্রান্ত ও মুগ্ধের অপূর্ব ইতিহাসে পরিণত করিয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্যদেবের স্বর্গীয় ভ্রান্তির ইতিহাস এই কাব্য সাহিত্যে ছায়াপাত করিয়া তাহা চিরসুন্দর অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছে—কিন্তু চণ্ডীদাস এই আদর্শ কোথায় পাইলেন? ভাগবতে গোপীগণের মেঘদর্শনে ভ্রান্তির উল্লেখ নাই; তাঁহার বর্ণিত রাধার পরম দৈন্য, পূর্বরাগের অপূর্ব আবেশ, আমাদিগকে চৈতন্য-প্রভুর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। যেরূপ সমুদ্র-সন্নিহিত গঙ্গাধারার বিশালতা সমুদ্রের আভাস প্রদান করে,—চণ্ডী-দাসের পদগুলি সেইরূপ চৈতন্যপ্রভুর চরণপ্রান্তে আমাদিগকে পৌঁছাইবার পরম পন্থার সূচনা নির্দেশ করিয়া থাকে।

আর একটি কথা, চণ্ডীদাসের প্রেম কোন উপমায় আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায় নাই,—কবি উপমাগুলিকে হাতে লইয়া দেখিয়াছেন, তাহারা হাজার সমৃদ্ধ হউক, তাঁহার প্রেমের পরিচয় দিবার পক্ষে তাহারা অকিঞ্চিৎকর, এজন্য তিনি তাহাদিগকে কখনও কখনও যাচাই করিয়া লইয়াছেন, "কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল, না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল"—যে আসিবার প্রতীক্ষা রাখে, না আসিলে নিজে যায় না—যাহার লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে, কুল রাখিবার ভয় আছে, সে আবার কিসের প্রেমিকা? সুতরাং ফুল ও ভ্রমরের উপমা মেকি সাব্যস্ত হইল, সূর্য ও পদ্মের প্রেমের কথা কবিরা গাহিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস বলিলেন, "হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে"—একের মৃত্যু যখন অপরে উপেক্ষা করিতে পারিল, তখন আবার প্রেম কি?

চকোরকে চন্দ্রের প্রেমমুগ্ধ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কবি বলিয়াছেন, "কি ছার চকোর চাঁদে দুঁহু সম নহে"—দুইজনে তুল্য না হইলে প্রেম হয় না ; সুতরাং "ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।" রাধাকৃষ্ণকে কবি এইভাবে এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। এক পংক্তিতে আসন দিলেই যে তাহা যথার্থই প্রেম হইবে, এমন নহে,—সাধারণ নায়ক-নায়িকাও অনেক সময় আপনাদিগকে পরস্পরের তুল্যজ্ঞান করে; তাই বলিয়া তাঁহাদের প্রেমের ইতিহাস খুব উচ্চ সাহিত্যের অন্তর্গত হইবে এরূপ বলা যায় না। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার আসন একস্থানে এবং তাহাতেই মাধুর্য ভাবের চরম প্রদর্শিত হইয়াছে ; সেরূপ পদ চণ্ডীদাসের অসংখ্য : কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তি বলিয়া একটা একটা ভাব আছে প্রেম বড় কি ভক্তি বড়, তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন ; কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাক যে, প্রেম বড়। তথাপি ভক্তির একটা উচ্চ স্থান ভাবরাজ্যে সর্বদাই থাকিবে,—কৃষ্ণকে কখনও রাধা আপনার তুল্য জ্ঞান করিয়া গালি দিতেছেন, আপ্যায়িত করিতেছেন, কখনও বা তাহাকে উচ্চস্থানে দেখিয়া প্রণাম করিতেছেন, যশোদা কোন কোন স্থানে কৃষ্ণের হাত বাঁধিতেছেন, কোথাও বা তাহার মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িতেছেন। দেবতার সঙ্গে আমাদের প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তাহা এইরূপ হয়, কখনও বা তাহাকে অবতার রূপ কল্পনা করিয়া মানুষের সঙ্গে সমদুঃখী ও একস্থানে আসীন কল্পনা করি, কখনও বা তাঁহাকে নির্গুণ ও মনোবুদ্ধির অতীত ভাবিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ি। এই প্রেম ও এই ভক্তি উভয় সম্বন্ধেই আমরা তাঁহার সঙ্গে জড়িত ; সুতরাং যখন রাধা বলিতেছেন "অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়ালিনী, আমি অতি দীনা না জানি ভজন পূজন।"—তখন যদিও তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আর এক আসনে স্থিত নাই, যদিও তখনও দেবতার সঙ্গে মানুষ স্বতন্ত্র হইয়া হইয়া গিয়াছে, তবুও ভাবের হিসাবে সম্বন্ধ সুদৃঢ় রহিয়াছে,—ভক্তিতে নুইয়া পড়িয়া পরক্ষণেই রাধা উঠিয়া বলিতেছেন, "কলঙ্কী

বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ,—তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।” অসীমে সসীমে এইভাবে মিলন হয়, এক সময়ে মনে হয় দূরপ্রান্তে হরিদ্বর্ণরাজি দিকবলয় স্পর্শ করিয়াছে, ব্যবচ্ছেদরেখা তখন মিলাইয়া যায়—আবার অপরক্ষণে মনে হয় উহা মিশে নাই, আকাশ পৃথিবী হইতে বহু উর্ধ্বে রহিয়াছে, কিন্তু যখন আকাশ বহু উর্ধ্বে কল্পিত হয়, তখনও সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায় না, ধ্যানমগ্ন ও মুগ্ধ নির্ভরের ভাবে ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহারই আলোকের প্রতীক্ষা করে, ইহারই নাম ভক্তি। ক্ষণে গলা জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন, পরক্ষণে যুক্ত করে প্রণিপাত, দেবতার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ, আমরা সমান না ভাবিলে মনের কথা বলিব কিরূপে—উচ্চতর, উচ্চতম না ভাবিলে প্রণিপাত করিব কিরূপে? এই দুই সম্পর্কই চণ্ডীদাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি ভক্তির কথা লিখিয়াছেন বলিয়া খর্ব হইয়া পড়েন নাই।

তাঁহার স্বল্প উপমাহীন, বিরল কথায় প্রেম যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার উদাহরণ কোথায় পাইব?

সুধীররঞ্জন ঘোষ॥ গীতিকবিতায় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস।
(বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৭)

কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন “কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।” কিন্তু কবিতা বিশেষ অমৃত, কবি বিশেষ অমর। কবি কালিদাস অমর, কবি সেক্সপীয়র অমর, শেলী কীটস্ বায়রণ অমর, তাঁহাদের কবিতাও অমৃত।

আর বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি, তাঁহারও অমরত্বের দাবি কে অস্বীকার করিবে? বাংলার সাহিত্য আকাশের উদয়শিখরে তিনি প্রভাত সূর্যের মত উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখমণ্ডলে নবীন দীপ্তি, নবীন গরিমা দান করিয়া গিয়াছেন, বাংলার ভাব, বাংলার ভাষাকে নূতন পথে চালিত করিয়া এই সুললিত বাংলা সাহিত্যের পথ দেখাইয়া

গিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের গুরু। ইংরেজী সাহিত্যে Chaucer এর যে স্থান, বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থানও সেইরূপ।

কবি চণ্ডীদাস প্রচলিত মতে চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। অনেকের মতে তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। তাঁহার পূর্বে বাংলাভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বাংলা সাহিত্য তখন কেবল শৈশব অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে। তখনও তাহার পরিপুষ্টি হয় নাই। তাহার উপর সে সময়ের সামাজিক অবস্থা। দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ও উড়িষ্যার দুর্দিন চলিয়াছিল। ভাববিকার, রুচিবিকার সমাজের উচ্চতর সমাজ হইতে নিম্নতর স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে যুগের বাংলা ভাষার রূপ ছিল অমার্জিত; রুচি ও ইঙ্গিত ছিল বিকৃত। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে যতই উচ্চ-ভাব ও লালিত্য থাকুক না কেন তাঁহারও রুচিবিকার উপেক্ষা করিয়া যাওয়া যায় না। এই অমার্জিত সাহিত্যক্ষেত্রে কবি চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় বড়ই মঙ্গল সূচক। সেই প্রাচীন বিকৃতরুচি গীতিকা সাহিত্যের উপর আপনার অপূর্ব কবিপ্রতিভা বলে চণ্ডীদাস নূতন আলোকপাত করিলেন। বর্তমান যুগের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়া তিনি ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রপূত অঙ্গুলিস্পর্শে বাংলাভাষায় নবজীবন সঞ্চার হইল, সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায় গড়িয়া উঠিল। প্রথম হইলেও কবি চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম।

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমই তাঁহার কবিতার প্রাণ, সৌন্দর্য, সৌরভ। তাঁহার রচনাবলী প্রায়ই গীতিকবিতা। গীতিকবিতাতেই চণ্ডীদাস প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফূর্তি। গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ দান, তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি। কবি চণ্ডীদাস বলিতে আমরা শুধু গীতিকবিতাতেই তাঁহাকে বুঝি।

এখন গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা জানিতে হইবে। গীতিকবিতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ (১) নাতিদীর্ঘ সহজ, সরল, আবেগপূর্ণ কবিতা বুঝি। (২) ঐ কবিতার প্রাণ ব্যক্তিগত কোন

বিশেষ ভাব বা আবেগের পূর্ণ বিকাশ (emotionalism) (৩) ইহার বর্ণনীয় বিষয় প্রেম, তাহার বিভিন্ন অবস্থা—মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ অভিমান, অনুযোগ, নিবেদন ইত্যাদি। (৪) এই কবিতার রূপ, গতি ও ভঙ্গি অতি সহজ ও সরল। এখানে শব্দের সুললিত ঝঙ্কার, সঙ্গীতের মূর্ছনা, সুরের আলাপ বাঁধা থাকে। এইজন্যই ইহাকে গীতিকবিতা বলা হয়। ৫) গীতিকবিতায় সাধারণতঃ একটি ভাবের পূর্ণ বিকাশ থাকে, সেইভাবে একেবারে ব্যক্তিগত মনের, হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রাণপূর্ণ উচ্ছ্বাস। এখানে অপরের কথা লইয়া বর্ণনা করিবার সুযোগ নাই, অপরের কার্যাবলী কীর্তনের স্থান নাই। শুধু কবি নিজে হৃদয়ের প্রবল দুর্নিবার আবেগ প্রেমের তাড়িত স্পর্শে ও প্রবল উচ্ছ্বাসে স্বতঃই বাহিরে আসিতে চায়. কখনও আপনার রূপেই ধরা দেয়, কখনও বা অপরকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। গীতিকবিতায় কবিহৃদয়ের ছবি পাই। কবির অন্তরাত্মা এখানে সহস্ররূপে বাহির হইয়া আসে। এখানে আছে কবির সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, আপনার প্রেমের আনন্দের দুঃখের সঙ্গীতরসাস্বাদ।

বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার উৎপত্তি জয়দেবের সুললিত সহজ রাধা-কৃষ্ণমূলক সঙ্গীতগুলির মধ্যে। তাঁহার সময় হইতেই বাংলাদেশে গীতি-কবিতার স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই স্রোত বাংলাসাহিত্যে কলনাদিনী তটিনীর রূপ ধারণ করিল বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর মধ্য দিয়া। আর সেই রচনার প্রথম গুরু কবি চণ্ডীদাস। তাই চণ্ডীদাস বাংলা গীতি-কবিতার আদি কবি।

গীতিকবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নিজস্ব নয়। প্রত্যেক দেশেরই সাহিত্যের মধ্যে গীতিকবিতার (Lyrics) একটি বিশেষ স্থান আছে। ইংরাজ কবি Shelley, Keats, Byron, Scott, Browning প্রভৃতি সকলেই আপনাদের বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে অনেক গীতিকবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশেও চণ্ডীদাসের পরবর্তী কবিরাও গীতি-কবিতায় আপন আপন কবিপ্রতিভার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। চৈতন্যপর বৈষ্ণব কবিগণ, বিহারীলাল, মধুসূদন, নবীন চন্দ্র, হেমচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথ সকলেই অল্পবিস্তর গীতিকবিতাতে আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমন কি আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যেও গীতিকবিতার ছড়াছড়ি। এই সকল রচনাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের রচনা আলোচনা করিলেই গীতিকাব্যে চণ্ডীদাসের স্থানকতকটা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে 'পদাবলীই' অমৃত ভাণ্ডার। পদাবলী রচনা ছাড়াও চণ্ডীদাসের আরও রচনা আছে। আর একখানি গ্রন্থ 'কৃষ্ণকীর্তন' অনেকের মতে তাঁহারই রচিত। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত তুলনা করিলে কৃষ্ণকীর্তন অনেক লঘু ও বিকৃত রুচিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকেই বলেন যে, 'কৃষ্ণকীর্তন' ও পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখা নয়। দীনেশবাবুর মতে দুইটিই চণ্ডীদাসের রচনা ; 'কৃষ্ণকীর্তন' চণ্ডীদাসের অল্প বয়সের রচনা ও পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা। বাস্তবিকই "কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নঈ কূলে''—কৃষ্ণকীর্তনের এই পদটি শুনিয়া কবির আর একটি অমর সঙ্গীত মনে পড়ে—"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

চণ্ডীদাসের রচনাবলীই তাঁহার গীতিকবিতার মালা। চণ্ডীদাসের গীতিকবিতা প্রেমের কবিতা, আত্মানুভূতির কবিতা, আত্মনিবেদনের সঙ্গীত। তাঁহার রচনায় যে ব্যাকুলতা আছে, যে আবেগ আছে, যে গভীর মর্মস্পর্শী হৃদয়ঝঙ্কার আছে, তাহার তুলনা আছে কি না বলা যায় না। চণ্ডীদাসের বর্ণনা নিখুঁত। যদিও তাঁহার ভাষা অনেক রূপান্তরিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তথাপি তাহার মধ্যেই আমরা তাঁহার ভাষালালিত্য বেশ বুঝিতে পারি। চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ, সরল, স্বচ্ছ। উদ্দাম তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, উন্মত্ত ঝটিকাবেগ নাই, নির্মল স্বাভাবিক গতিতে এ ভাষা আপনার মনে আপনি বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও চিরবিরহী হৃদয়ের করুণ অশ্রুনির্ঝর, কোথাও অপূর্ব মিলনের নির্মল আনন্দধারা, কোথাও বা মান অভিমানের মধ্য দিয়া বাঞ্ছিতের

সহিত মিলিত হইবার দ্বিগুণ বাসনা চিরঅমৃতময় সঙ্গীতধারায় ভক্তিমার্গে তরঙ্গিয়া চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের ভাষার মধ্যে কোথাও চেষ্টা নাই, জোর করিয়া নানা উপমা অলঙ্কারে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়াস নাই। এখানে দুর্বোধ্য কিছুই নাই; এ ভাষার মধ্যে অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াসা ভাব নাই; এ সঙ্গীতের চ্যুতি নাই, পতন নাই। সমস্তই অখণ্ড, সরস, সরল হইয়া হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভরিয়া আছে। এই ভাষার দিক দিয়া, এই সরলতা মাধুর্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাসের গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যের নবজীবন রসধারা।

চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি এক একটি ক্ষুদ্র, নাতিদীর্ঘ কবিতা, এক একটি ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি এমন সুর তাললয় যুক্ত যে প্রত্যেকটি একটি অখণ্ড, প্রকৃত সঙ্গীত। এই এক একটি সুকুমার সুরভিফুলে কবি চণ্ডীদাস বঙ্গবাণীর অঙ্গ ভূষিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণস্পর্শী সজীবতা, যে আবেগ আছে, তাহার তুলনা নাই। সরল, সত্য, সাধারণ কথায় মধুর সঙ্গীতরসে যে গান বাংলার দীন, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, গ্রাম্য কৃষকদের প্রাণে একটি মর্মস্পর্শী আবেগ আনিয়া দেয়, সেই ভাষায়, সেই সঙ্গীতেই কবি চণ্ডীদাস কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে সুরুচিপূর্ণ সমাজের উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী করিবার কোন চেষ্টা নাই। তাই চণ্ডীদাসের সঙ্গীত, গীতিকবিতা, পাশ্চাত্ত্য কবিতা হইতে বিভিন্ন। চণ্ডীদাসের কবিতা বুদ্ধিকে নাড়া দেয় দেয় না, একেবারে মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। তাই Swinburne এর Trimph of Tune, Shelleyর Episychidion প্রভৃতি গীতিকবিতা ঠিক একরূপ নয়। চণ্ডীদাসের মধ্যে এত বাহুল্য বর্ণনা নাই। তাঁহার কবিতা এত দীর্ঘও নয়। পাশ্চাত্ত্য কবিদের অপেক্ষা চণ্ডীদাসের কবিতা পবিত্রতায় অনেক উচ্চে। তাঁহার গভীর আকাশস্পর্শী পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতায় পাওয়া যাইবে না। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন; তিনি সাধক, ভক্ত, চিরবিরহী চির-তৃষ্ণার্তপরমাত্মার মিলনপিয়াসী ব্যাকুল মানব-আত্মার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

তাহার পর চণ্ডীদাস-কবিতার ভাব, আবেগ ও রস। চণ্ডীদাস ভাষাকে ভাবের একান্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ মনে করিতেন। তাঁহার রচনায় নানাবিধ শব্দবিন্যাস নাই, উপমাপ্রাচুর্য নাই, ভাষার উত্থান পতন, দুরূহতা নাই, প্রাঞ্জল স্বচ্ছ হৃদয়ের ছবিটি ছত্রে ছত্রে আপনি বাহির হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কবিতাগুলি বাস্তবিকই বাক্যময় চিত্রমালা। অনেকে বলেন চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া ভাষাকে তিনি নানা রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার শব্দসম্পদ তেমন না থাকিলেও তাঁহার পদলালিত্য কে অস্বীকার করিবে? ......

চণ্ডীদাস ভাবের কবি। কবিতা পড়িতে পড়িতে তাঁহার হৃদয়টিই আগে দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের যে 'অন্তর সহিত প্রেম বিজড়িত' রহিয়াছে তাহাই সহস্ররূপে বাহির হইয়া আসে। এমন গভীর প্রাণপূর্ণ আবেগ বুঝি আর কোন কবিতাতে নাই। চণ্ডীদাস নিজেই প্রেমিক, সাধক, রজকিনীর 'কামগন্ধহীন, নিকষিত হেমতুল্য প্রেমের চিরপূজারী। কবি চণ্ডীদাসের এই আত্মানুভূতি, এই ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস, রজকিনী রামীর প্রেম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই প্রেমই আবার রাধাকৃষ্ণের হৃদয়ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আপনার পূর্ণ বিকাশ, অবাধ স্বাভাবিক লীলা দেখাইয়া চলিয়াছে। চণ্ডীদাস কখনও রাধারূপে, কখনও বা কৃষ্ণরূপে প্রেমের আবেগ, উত্তাপ, সুখ, দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; ভাবের পূর্ণ প্রবাহে, কল্পনার নির্মল করস্পর্শে তাহাকে চিরসুন্দর স্বর্গীয় সৌরভ-ময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাস এত সুন্দর, তাই তাঁহার কবিতা এত অমৃতরসস্বাদপূর্ণ। এই যে ব্যক্তিগত ভাবোৎকর্ষ, এই আত্মনিবেদন ইহা পূর্বযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। Shelleyর কথায় "The worship the heart lifts above And the Heavens reject not"—এই ভাবের এই প্রেম বর্ণনার প্রথম কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস আদিরসের কবি, ভক্তিরসের সাধক।

চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, 'বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ'। 'বঁধু কি আর কহিব আমি, জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি' 'শীতল বলিয়া শরণ লৈনু ও দুটি কমল পায়, —এই মর্মবেদনা নিবেদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি বৈষ্ণব সাধনার রাধাভাবের চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ। দীনেশ বাবুর মতে, চণ্ডীদাসের রচনায় নায়িকা রাধা অপেক্ষা রাধা ভাবেরই অধিকতর বিকাশ। পদাবলী সাহিত্যে সর্বত্র আবার এই আধ্যাত্মিক ভাব তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই।

অনেকস্থলে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, বিরহ, মান সম্ভোগ, মিলন প্রভৃতি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত ভগবানের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ ও লীলাভাব তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি চণ্ডীদাসকে ছোট করা যাইতে পারে? কবিতা দর্শন নয়, নীতিশাস্ত্রও নয় গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে বাহিরে আনিতে হইবে। যাহা সহজে স্বাভাবিক ভাবে যে রূপ নিতে চায় তাহাকে তাই দিতে হইবে। জোর করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতায় সুন্দর করা প্রকৃত কবির কাজ নয়। তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের সমস্ত রচনা পাঠ করার পর মনে হয় যে, তিনি দেহবর্ণনা, রূপ বর্ণনা, দেহের সম্বন্ধ, দেহের মিলন অপেক্ষা ভাববিহ্বল প্রাণের প্রাণারামের রূপদর্শন, ও মিলনের আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। দেহের মিলন অপেক্ষা মনের মিলনকেই চণ্ডীদাস বড় বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা ভাবময়ী, উন্মাদিনী প্রেমবিহ্বলা, প্রথম হইতেই তিনি নাম শুনিয়া পাগল, তাই চণ্ডীদাসের কবিতায় পদে পদে আত্মবিসর্জন; স্বাধিকারলোপ, তন্ময়তা ও মধুর ভাব। তাই Shelleyর মত চণ্ডীদাসও "Innocent is the heart's devotion with which I worship thine"—এই প্রেমমন্ত্রেরই কবি। দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব উচ্চস্তরে লইয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যের চরম উৎকর্ষ ভগবানের পদে আত্মবিসর্জনে। পুনর্মিলনে রাধিকার মুখ দিয়া তাই কবি বলিয়াছেন—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ,
দেহমন আদি তোমাতে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন।
পীরিতি রসেতে ঢালি তনুমন দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন চায়।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালমন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম তোহারি চরণখানি।

নায়িকার এই প্রেমোচ্ছ্বাস ভক্তের আত্ম-নিবেদনে পরিণত হইয়া মানুষের সাধারণ সহজ স্বাভাবিক প্রেমকে স্বর্গদ্বারে লইয়া গিয়াছে। জগতের গীতিকাব্যে এমন মধুর আনন্দময় প্রেমের পরিণতি আর নাই। এ সঙ্গীত শুধু কবি চণ্ডীদাসের মনের কথা নয়, রাধাকৃষ্ণের মনের কথা নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রাণের ব্যথা নয়—ইহা বিশ্বমানবের মর্মের কথা, চির-বিরহী মানবাত্মার আশার বাণী—তাই সকলের মর্মস্থল এমন করিয়া স্পর্শ করে।

চণ্ডীদাসের রূপবর্ণনায়ও সংযম আছে। অকারণে তিনি শ্লীলতাকে সুরুচিকে আঘাত করেন নাই। দেহের সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যেও তাঁহার ভক্তির মধুর বিহ্বলভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "দুইটি মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাণ হানে,/পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে পরাণ সহিত টানে", আবার "দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" সম্ভোগ মিলন অধ্যায়েও 'পরশে অবশ' 'ভাবে ভরল মন' ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ও সৌরভময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য বর্ণনায় খণ্ড নয় সৌন্দর্য অপেক্ষা সমস্ত সৌন্দর্যটিই চিত্রপটের মত প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস প্রেমের একটি অবস্থা বর্ণনা করেন নাই, প্রেমের সকল অবস্থাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বরাগের শ্যাম নাম তাঁহার মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, 'মোহন চাহন নয়নের বাণ' তাঁহার পরাণ টানিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ের ভাষা বিরলে বসিয়া 'সদাই ধেয়ানে' মেঘের পানে চাহিয়াছিল, স্বপ্নসম প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জড়াইয়া গিয়াছিল, নাম জপিতে জপিতে তাঁহার তনু অবশ হইয়া গেল, সম্ভোগ মিলনে মন ভাবে ভরিয়া উঠিল, শয়নে স্বপনে শ্যামরূপ দেখিয়া, 'হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া জনম গেল, পুনর্মিলনে বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রেমভিখারী চণ্ডীদাসের মনে রোষনাই,ক্রোধ নাই, বরং তাহাতেপ্রেমের দ্বিগুণ আকর্ষণ। চণ্ডীদাসের রাধিকা হিয়ার মাঝারে যতনে মনের কথা বিরলে রাখিতে চান, 'শ্যাম চিকন ধন'কে ছাড়িতে পারেন না। তিনি সদাই মনে মনে ভয় করিয়াছেন "সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে।" ভাবসম্মিলনে চণ্ডীদাস উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধকের সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে--রাধিকা হইয়া তিনি গাহিয়াছেন :—

"শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে গলার হার।"
"তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈনু দাসী।"

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—গীতায় এই ভাবে রাধিকা উন্মাদিনী, কবি চণ্ডীদাস আত্মহারা। কৃষ্ণ হইয়া আবার তিনি বলিয়াছেন—'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী···ইত্যাদি—'গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা সকলে রাধারে দেখি—শয়নে ভোজনে গমনে রাধিকা রাধিকা সদাই মতি।" এখানে রাধিকা জগতের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় রাধিকা 'যুগে যুগে যেন তৃণে জলে ধূলির তলে' এক হইয়া রহিয়াছেন। 'বিটপীলতায় জলদের

পায়' জড়াইয়া রহিয়াছেন রাধাভাবে বিরাট বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। এই তন্ময়তা, বিশ্বব্যাপী প্রেমভাব চণ্ডীদাসের শেষবাণী।

বিদ্যাপতির গীতিকাব্যে ভাবাসম্পদ চণ্ডীদাসের অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু এত ভাবের ঐশ্বর্য নাই। দৈহিক বর্ণনায় তিনি অনেকসময়ে শ্লীলতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তবুও তাঁহার ভাবোল্লাসের অনেক পদই মনোরম। 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়িনু'র মতো পদ গীতিসাহিত্যে অতি বিরল। ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি এক এক স্থানে চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন! তাহার নিদর্শন তাঁহার অমর সঙ্গীত

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।'

তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের মত তত নির্মল স্বাভাবিক, সহজ, সরল ভাবোচ্ছ্বাস বিদ্যাপতির ছত্রে ছত্রে মিলিবেনা। বিদ্যাপতি সময়ে সময়ে চণ্ডীদাসের সমান উঁচু হইয়া উঠিয়া এক একবার ছাড়াইয়াও গিয়াছেন, কিন্তু বেশীর ভাগই তিনি চণ্ডীদাসের অপেক্ষা নিচু হইয়া চলিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যে যাহার একান্ত প্রাচুর্য, বিদ্যাপতি-সাহিত্যে তাহার কচিৎ প্রকাশ।

কালিদাস রায় ॥ চণ্ডীদাস। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১৩৫০

চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা তাঁহার কবিতায় বলিয়াছেন—তাহা সার্বজনীন ও সার্বভৌম। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থদ্যোতনা যে হয় না তাহা নহে। প্রেম গভীর হইলেই তাহা লৌকিক গণ্ডী ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যায়—রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকিলেও তাহা হইত। কবিতাগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও বিশেষ নাই—কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় চিরন্তন তত্ত্বের আলোকপাতে ইহা আধ্যাত্মিকতায়

*এই তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি—

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের

মণ্ডিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনী Romantic কবিতাগুলিকে একটা Mystic Interpretation দান করিয়াছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রেম-কবিতাগুলি লৌকিক জীবনের দিকেই আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। চণ্ডীদাসের প্রেমের গান শুনিয়া ভক্তের চিত্ত স্বতই উর্ধ্বদিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত আমাদেরই চারিপাশের সমাজ সংসারের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—

এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্তপ্রেম তৃষা ?

ইহাতে চণ্ডীদাসের গানের সাহিত্যিক মূল্য বিন্দুমাত্র কমিতেছে না। কারণ লৌকিক গণ্ডীর মধ্যে গানগুলির অবস্থান হইলেও উহাদের গভীরতম বাণী অতিলৌকিক রসলোকেই পৌঁছিতেছে। অনির্বচনীয় আস্বাদ্যমানতা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি না। কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থও ব্যঙ্গার্থ মাত্র। ব্যঙ্গ্যার্থের আবিষ্কার ও রসাস্বাদন এক কথা নয়। ব্যঙ্গ্যার্থের আবিষ্কার রসাস্বাদনে সহায়তা করে মাত্র, কোন কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেই তাহা রসোত্তীর্ণ হইল না। বাচ্যার্থের সাহায্যে কোন কবিতা যেভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যেও তাহাকে সেইভাবেই রসোত্তীর্ণ হইতে হইবে—নতুবা

মধ্যে পরিচ্ছন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

তাহা ধর্মতত্ত্ব হইবে—কাব্য হইবে না। অবশ্য যে কবিতা আধ্যাত্মিক অর্থের সাহায্যে রসোত্তীর্ণ হয়, তাহাকে আমরা অনেক সময় Mystic কবিতা বলিয়া থাকি।

চণ্ডীদাসের কবিতার Mystic মূল্য যাহাই থাকুক—লৌকিক মূল্যের জন্যই তাহা রসোত্তীর্ণ। এখানে কবিতাগুলির লৌকিক মূল্যের কথাই বলিতেছি। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি—তিনি লৌকিকতার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়াই চলিয়াছেন।...

সমাজ সংসার প্রেমের মর্যাদা বুঝে না—তাহারা বুঝে নিজেদের আধিপত্য ও বিধি-বিধান নিয়মশৃঙ্খলার কথা। তাহারা যখন নিয়ম-শৃঙ্খলার বিধি-বিধান রচনা করিয়াছে—তখন তাহারা অবশ্য সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রেমকে তাহারা হয় বিলাস—নয় স্বপ্ন—নয় অলীক মোহমাত্র মনে করিয়াছে। প্রেমের অন্তস্তলের গভীর সত্যকে তাহারা স্বীকার করে নাই। তাহারা বলে—"প্রেম করিতে হয় আমাদের বিধি-বিধান মানিয়া আমাদের শাসনেই প্রেম কর ; তাহা যদি না কর আমরা তোমায় দণ্ড দিব—আমরা তোমার বৈরী হইয়া দাঁড়াইব।"

আমাদের আদিম অবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলার হয়ত' এত বাধাবাঁধন ছিল না। তারপর ক্রমে লোকাচার, কুলাচার, জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক বিধি-বিধানের জটিলতা ও কড়াকড়ি বাড়াইয়া দিয়াছে। সামাজিক সংস্কার ও প্রেমের এই দ্বন্দ্ব সকল দেশের সম্বন্ধেই খাটে। প্রেমের আকর্ষণ দেশকালাতীত সার্বজনীন মানবধর্মের উপর নির্ভর করে, প্রেম কোন দেশবিদেশের সমাজ বা সংসারের শাসন মানিয়া চলে না।

সামাজিক বিধি-বিধানের জটিলতাই জটিলা, তার প্রকৃতি-বিরোধী ব্যবস্থার ভ্রূকুটি-কুটিলতাই কুটিলা এবং প্রেমই রাধা।

প্রেম যেখানে অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত দুর্নিবার, সেখানে সে

সমাজ সংসারের শাসন মানিয়া চলিতে পারেনা। সকল বাঁধন কাটিয়া সে সিন্ধুর উদ্দেশে শৈবলিনীর মত ছুটিয়া যায়, তখন সমাজ সংসারের সকল অস্ত্র উদ্যত হইয়া উঠে—সহস্র রসনা ফণা তুলিয়া বিষোদগীরণ করিতে থাকে। প্রেমিকার জীবনে তখন দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা দুর্বিসহ। প্রেমের ইহাই দারুণ দণ্ড। এইখানেই শেষ নয়—ইহার উপর যাহার জন্য এত জ্বালা, সে যদি উপেক্ষা করে অথবা ভুলিয়া থাকে—তাহা হইলে প্রেমিকার আক্ষেপের অবধি থাকে না। জগতে এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। ইহা প্রেমপাশজড়িত অবলা জীবনের নিদারুণ Tragedy-এই সংসারে ঐ হতভাগিনীর মত অসহায় নিরাশ্রয় যেন কেহই নাই। এই অবলা জীবনের গূঢ় গভীর বেদনার বাণী আমরা চণ্ডীদাসের কবিতায় পাই। শ্রীমতীর অন্তরে জগতের নিখিল উপেক্ষিতা প্রেমিকা এক কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহাই চণ্ডীদাসের কবিতার লৌকিক রূপ।

অভিমানিনী শ্রীমতী কখনও প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছেন, কখনও তাঁহার উদ্দেশ্যে কাকুতি মিনতি করিতেছেন, কখনও সমাজ সংসারকে গালি দিতেছেন, কখনও প্রেমেরই নিন্দা করিতেছেন, কখনও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন, কখনও নিজের অশরণতার কথা বলিতেছেন এবং কখনও বা মৃত্যু কামনা করিতেছেন। এই আক্ষেপের জন্য আধ্যাত্মিক অর্থের প্রয়োজন নাই—শ্রীমতীকে স্বয়ং লক্ষ্মী বানাইবারও প্রয়োজন নাই, কোন তত্ত্বের সাহায্য লইয়া এই আক্ষেপের ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। জগতের সকল প্রেমিকের প্রাণের বাণী যাহা, তাহাই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সার্বজনীন মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীদাস যে ভাষায় শ্রীরাধার আক্ষেপাভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন পুরা বাঙ্গালীর ঘরোয়া ভাব আছে—তেমনি অন্যদিকে সার্বজনীন আবেদন (Universal appeal) আছে—একদিকে

যেমন মনে হয় এই রাধা আমাদেরই গ্রামের এমনকি আমাদের পাড়ারই রাধা—অন্যদিকে তেমনি মনে হয় এ যেন যুগযুগান্তরের দেশদেশান্তরের রাধা।

চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখানি কল্পিত, কিন্তু রাধাটি একেবারে বাস্তব। স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে সত্যের এমন প্রতিষ্ঠা জগতের অল্প সাহিত্যেই আছে।

যে রাধা বলিয়াছেন প্রেমের জন্য 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' তাঁহার জীবনে ঘর ও বাহির (Home and the world) দুইই পাইতেছি—বাংলার নিজস্ব পল্লীজীবনই ঘর, বিশ্বজনীনতাই বাহির।

রাধা বলিতেছেন—

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
ছার দেশে বসতি নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী নইলে না জানে বেদনা॥

প্রেমের স্পর্শ সকলের ভাগ্যে ঘটে না—কচিৎ কেহ প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। যে অনুভব করে, তাহার যে কি জ্বালা, তাহা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 'কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে' সেজন্য চিরকাল অপরে প্রেমিকপ্রেমিকাকে পাগল, নির্বোধ, ভ্রান্ত, বিদ্রোহী,—এমনকি পাপপথচারী মনে করে। সেজন্য তাহাদের প্রতি কাহারও দরদ বা সহানুভূতি থাকে না। প্রেম চিরকালই নিরাশ্রয়—অসহায়। প্রেমিকা চিরদিনই 'সোতের সেঁওলি'।

দুঃখের উপর দুঃখ, দরদী মনে করিয়া কাহারও কাছে প্রাণের কথা বলিলে সে যে কৃত্রিম হৃদয়হীন অলীক প্রবোধ দেয় তাহাতে ব্যথা আরও দ্বিগুণিত হয়, আবার কেহ কেহ বা ধর্মোপদেশ দেয়।

'মরম না জানে ধরম বাখানে সে আরও দ্বিগুণ ব্যথা।'

মনের কথাটি কাহাকেও বলিয়া যে হৃদয়ের ভার লঘু করা যাইবে, প্রেমিকার সে উপায়ও নাই।

'এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী'

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা আগে বাঙ্গালার রাধা, তারপর বিশ্বের রাধা। চণ্ডীদাসের কবিতায় যতই অলৌকিক ইঙ্গিত থাকুক, তিনি তাঁহার রাধিকাকে লৌকিক জীবনের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান নাই। সেই-জন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাসের রাধা আমাদের এত অন্তরঙ্গ।

কবিকৌশলের জন্য চণ্ডীদাস বড় কবি নহেন। চণ্ডীদাস যে পীরিতির গান গাহিয়াছেন, সে পীরিতি রসজীবনের চরম সৃষ্টি। এ পীরিতি লৌকিক জগতে দুর্লভ। ইহার কাছে জীবন যৌবন, ধন জন মান সব তুচ্ছ। এই পীরিতির সর্বস্বলুপ্তিভাব আমাদের চিত্তকে লৌকিক জীবনেই পরিচ্ছন্ন রাখে না। ইহা অলৌকিক—ইহা আমাদের চিত্তকে অতীন্দ্রিয় লোকে লইয়া যায়, আমাদের জীবাত্মার অন্তরে যে চিরন্তন ব্যাকুলতা—অজানা অনন্তের জন্য যে শাশ্বত আগ্রহাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত আছে তাহাই জাগাইয়া তুলে। তাহাতে অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা, অস্বাতন্ত্র্য ও পরবশ্যতার বেদনা জাগিয়া উঠে, তাহা বিচ্ছেদের বেদনারই মত। আমাদের চিত্তও রাধিকার মত চিরন্তনের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ইহা সেই বিরহের গান, সেই মোহমন্ত্রগান, যাহা কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা, জাগাইয়া তুলে। চণ্ডীদাসের গানের ইহা Mystic না হউক, transcendental interpretation'। রবীন্দ্রনাথ এই অজানা অনন্তের তৃষ্ণাকে বলিয়াছেন—মানবাত্মার "চিরবিরহিণী নারী"।

শ্রীরাধার প্রেমাবেশ বর্ণনায় চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের ভগবত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার অন্তরের মধ্যে যে চিরবিরহিণী রাধা বিরাজ করিতেছে—তাহার আকুতি আকুলতাকেই তাঁহার রচনায় রসরূপ দান করিয়াছেন। রাধিকার আর্তি আকুলতার গহনতায় আমরাও ভাগবত

বা পুরাণের কথা ভুলিয়া যাই—রাধা যে ব্রহ্মের মোহিনীশক্তি তাহাও আমাদের মনে থাকে না। রাধা আমাদের কাছে চিরন্তনী নারী, জীবাত্মাও নয় ভক্তও নয়। আমাদের অন্তরের 'চিরবিরহিণী নারীই' ঐ রাধার সঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠে। ইহার সহিত ব্রহ্মাস্বাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসের সহিতই ইহার সম্পর্ক।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় যদি সাধারণ নরনারীর প্রণয়রূপেই পরিকল্পিত হইত, তাহা হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাত্মার উদ্দেশে অনিত্যেরই হউক, আর, মানবের উদ্দেশে মানবীরই হউক, প্রেম সেই একই অনির্বচনীয় বস্তু। সর্বস্বপণ আত্মহারা এই যে প্রেমের আকুতি, ইহা আমাদের চিত্তকে আখ্যানবস্তুর সকল গণ্ডী এবং দেশ-কালের সীমা পার করিয়া কোথায় লইয়া যায়—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সে কি কোন স্বপ্নলোক? সে কি কোন অনাবিষ্কৃত ভাবলোক? সে কি মহামানবতার হৃদয়লোক? তাহা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। যাহারা এই গভীর প্রেমের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা যে স্বাদ পাই তাহারও তুলনা কোন লৌকিক স্বাদের সহিত সম্ভবে না, ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

স্পষ্ট কথা, সত্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরল কথা, অন্তরের অন্তস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদ্গীর্ণ কথা কেমন করিয়া বিনা আড়ম্বরে, বিনা কলাশ্রীমণ্ডনে, বিনা আলঙ্কারিক চাতুর্যে কাব্য হইয়া উঠিতে পারে, চণ্ডীদাস তাহা দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের রচনা সম্পূর্ণ মনোবেগ সঞ্জাত, ইহার রচনাক্রম সম্পূর্ণ আবেগাত্মক বা Emotional. ইহাতে যুক্তিমূলক ক্রম (Logical sequence) সন্ধান করা বৃথা।*

---

* অনেক পদে আমাদের যুক্তিসন্ধিৎসু মন ঐ ক্রম অনুসন্ধান করিতে চায়, না পাইয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়। মনে হয়, যে কথার পর যে কথার আসিবার সম্ভাবনা তাহা যেন আসিল না।

প্রাণের গভীর সত্যের বাণী যেখানে রসরূপ ধরিয়াছে, সেখানে অলঙ্কারশাস্ত্র হতদর্প স্তম্ভিত। গভীর প্রেমের ভাষাই স্বতন্ত্র। এ ভাষা পূর্ববর্তী সাহিত্য জানিত না। এ ভাষার প্রবর্তক চণ্ডীদাস। অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্য এ ভাষা বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। তাই অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যের পর চণ্ডীদাস নিশ্চয় আবির্ভূত হইয়াছেন।

ব্রজলীলা-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যে বাঙ্গালীহৃদয় মন্থনে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই বাঙ্গালী হৃদয়ে এই ভাষামৃত নিশ্চয়ই সঞ্চিত ছিল। কবি বাঙ্গালী প্রাণের সেই অন্তঃসুপ্ত ভাষাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন, অন্তঃসুপ্ত কাকলী যেমন বিহগের সঙ্গীতে পরিণত হয়। যুগে যুগে বাঙ্গালীর প্রেমিক হৃদয় যে ভাষায় অন্তরের গভীরতম আকুতি প্রকাশ করিয়াছে, ইহা সেই ভাষা।

এক একবার তাই মনে হয়, এই পদাবলী যেন চণ্ডীদাসের সৃষ্টি নয়, চণ্ডীদাসের আবিষ্কার। যুগ যুগ হইতে বাঙ্গালীর অন্তরেই যেন এই কথাগুলি প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, উপযুক্ত কবির অভাবে সেগুলি মূর্চ্ছনা লাভ করে নাই। চণ্ডীদাসই সেই কবি, যিনি ঐগুলিকে ছন্দে সুরে বাণীরূপ দান করিয়াছেন।

রাধাশ্যামের পীরিতি বড় আদরের, বড় আকুতির, বড় বেদনার ধন। এই শ্যাম মানুষও নয়, দেবতাও নয়। বাঙ্গালী হৃদয়ের সমস্ত সৌকুমার্য, মাধুর্য, স্নেহমমতা, প্রীতি ও সরলতা যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া উপচিত হইয়া শ্যামসুন্দর মূর্তি ধরিয়াছে। আর তাহার আর্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা আকুলতা ও জীবাত্মার অন্তর্নিহিত অতিলৌকিক পিপাসা সমস্ত একত্র মিলিয়া রাধারূপ ধরিয়াছে। সেই রাধাশ্যামের প্রেমলীলার কথা গাহিয়াছেন রসের গুরু বাঙ্গালীর রসজীবনের মূর্তিমান বিগ্রহ কবি চণ্ডীদাস। তাই এই লীলাকথাকে রসোত্তীর্ণ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। সেইজন্যই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকলেই উপভোগ করিয়াছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। কবিতাপস চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, (১৩৬৭)

চণ্ডীদাস কি আধ্যাত্মিক কবি?

—চণ্ডীদাসের মত কবিরা আছেন বলিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাঙ্‌ময় হইতে পারিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের মত জীবন, চণ্ডীদাসের মত কাব্য—আধ্যাত্মিকতার এত বড় সাক্ষ্য প্রমাণ আর কোথায়? যাঁহারা আত্মদর্শন লিখিবেন, দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহাদের বারবার ঐ প্রেমজীবন ও কবিজীবনের আঙিনা দ্বারে আসিতে হইবে। চণ্ডীদাস আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের সমগ্র চেতনার রূপান্তরে দিব্য সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন,—তিনি যখন ভাবের ও রূপের কথা বলেন, তখন একরূপে, নিত্যচেতনার স্বরূপে, তাহাই চূড়ান্ত সৃষ্টি হইয়া যায়। চৈতন্যের পূর্বে বা পরে হউন, চণ্ডীদাস চৈতন্যের অনাযাস্থিত যে স্বরূপ-চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহাই অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচিত্র—চৈতন্যতত্ত্বের মুখ্য কবি গোবিন্দদাসও সেখানে পরাভূত প্রজাপতি।...

...গভীরতম অর্থেই তিনি আধ্যাত্মিক। তাঁহার রাধার প্রেমকে প্রাণময় বা সত্তাময় বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না,—তাহা রক্ত, মাংস এমনকি অস্থিময়। যেখানে প্রেমে নিত্য 'সতীদাহ'—যেখানে চূর্ণ পঞ্জরাস্থির উপরে প্রেমনিশান ওঠে সে প্রেমকে গতানুগতিক অর্থে ধর্মীয় প্রেম বলিলে অসম্মান করা হয়—তাহা চরমার্থে আধ্যাত্মিক। পূর্বরাগে সত্তার জাগরণ, রূপানুরাগে দৃষ্টিপ্রদীপের আরতি, আক্ষেপানুরাগে বেদনাগ্নিতে আত্মশোধন, মিলনে একরাত্রির দীপান্বিতা, রসোদ্গারে স্মৃতিচর্বণ, প্রেমবৈচিত্ত্যে জন্মান্তরীণ ভাবোদ্বোধন, মাথুরে নিশাগাহন এবং ভাবোল্লাসের নিত্যবৃন্দাবন। অধ্যাত্মসাধনার এমন বিকাশক্রম আর কোথায় পাইব! বৈষ্ণবপদকারকের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই মিষ্টিক। রাগাত্মিকতার সঙ্গে মিষ্টিসিজমের গভীর সম্পর্ক; চণ্ডীদাস রাগাত্মিকতার ভাবুক ও সাধক। তিনি মৌনের মহান সঙ্গীতকার।

তিনি এত বলিয়াছেন, তবু যেন কিছুই বলেন নাই। তিনি নৈঃশব্দের মহাকবি।...

প্রগল্ভ চঞ্চলতা, সহর্ষ উচ্ছ্বাস, উদ্দীপ্ত উল্লাস, সমুদ্রবিস্তার ব্যাপ্তি, নীরব সায়রে গাহন—প্রাণের কত 'রূপ'ই আছে। চণ্ডীদাসের রাধা অপরপক্ষে জীবনের ঐকান্তিক অপসৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাপ্তির উৎসবরাত্রে লোককণ্ঠের কোলাহল;—এ রাধা পাইল না। 'কূলে কূলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালো' একটি অশ্রুময় চির-বিশ্রাম তাহার জন্য। সেখানে কেহ নাই, সখীরা পর্যন্ত নয়,—নিঃশব্দের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চেতনার স্বর্ণরেখার মত একটি রূপকে,—রাধিকাকে, দূর হইতে দেখার সৌভাগ্য—সে আমাদের যুগ যুগের সৌভাগ্য।

সেই রাধার পাশে রাধার পাশে রাধা-কবি। বেদনার কালীদহে সিত পদ্মের মত এই কবি। চণ্ডীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলোছলো আত্মা—চণ্ডীদাসই তাহা জানাইয়াছেন। যত মৃদুকণ্ঠে করা হোক না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত স্তোত্র বা বন্দনাই কর্কশ ও শব্দমুখর মনে হয়। তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে তাই ভয় জাগে। এত শান্ত, সুস্থির, শিশির বিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা।

জ্ঞানদাস

রাধাবল্লভ ॥ জ্ঞানদাস বন্দনা ।

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস ।
এ গৌড় মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ ॥
সুধামাখা যার পদাবলী ।
শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি ॥
কবিত্ব-সরসী মাঝে যার ।
রসিক-মরাল সদা দেয়ত সাঁতার ॥
গাইল ব্রজের গূঢ় রস ।
দরবে মানস যার পাইয়া পরশ ॥
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য ।
অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পুণ্য ॥
কোমল চরণ পদ্মে তার ।
করে রাধাবল্লভ প্রণতি বারেবার ॥

জ্ঞানদাস ॥ (বঙ্গদর্শন, ১২৮০)

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস সর্বোৎকৃষ্ট কবি বলিয়া খ্যাত, এজন্য তাঁহারা কতক সুপরিচিত। আরও কয়জন কবি আছেন, তাঁহাদিগের রচনা সচরাচর তত উৎকৃষ্ট নহে; তাঁহারা তত বিখ্যাতও নহেন। অথচ তাঁহারা অনেকেই সুকবি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

বৈষ্ণবদিগের কবিতা, সকলই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অন্য বিষয়ক কবিতা পাওয়া যায় না। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে, তাঁহাদিগের গুণ এই যে, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। মনুষ্যহৃদয়ের সঙ্গে মনুষ্যহৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়—যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ নামে বিরক্ত, তাঁহারা উক্ত নামদ্বয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন কোন ক্ষতি হইবে না। আর যখন রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালী জাতির অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া, জাতীয় কবিতার জাতীয় চরিত্র নিরীক্ষণে পরান্মুখ হইলে চলিবে না—দেহ কাটিয়া শরীরতত্ত্ব না জানিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না।

জ্ঞানদাস কে, তাঁহার কোথায় নিবাস, তিনি কোন শ্রেণীর লোক ছিলেন, কোন সময়ে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানিনা।

জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। তথাপি আদরণীয়। কিন্তু তাঁহার কবিতা মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট।

বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনায়, অপ্রাকৃত বর্ণনা দোষ তাদৃশ দেখা যায় না—ভারতচন্দ্রাদি আধুনিক কবিদিগের রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয়। "নিদ যাই মনের হরিষে" শ্রাবণ রজনীতে, বৃষ্টির সময়ে "কোকিল কুহরে কুতূহলে" "ডাহুকী সে গরজে" এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ।

বিদ্যাপতি যে ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন—হিন্দীর সদৃশ। দেখা যাইতেছে জ্ঞানদাসের কতকগুলি গীত প্রচলিত ভাষায় লিখিত। আবার কতকগুলি গীতে বিদ্যাপতির ভাষা অনুকৃত হইয়াছে। অতএব কোন কোন কবি যে ইচ্ছাপূর্বক হিন্দী মিশাইতেন, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্তও করা যায় না যে বিদ্যাপতির ভাষা কৃত্রিম। ভারতচন্দ্র বা জ্ঞানদাসের হিন্দী বা ব্রজভাষা ছদ্মবেশী বাঙ্গালা, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, কোনস্থলে বুঝিবার কষ্ট নাই। বিদ্যাপতির ভাষা একেবারে অনেক স্থানে বুঝা যায় না। বোধ হয় বিদ্যাপতির ভাষা প্রকৃত—তিনি মাধুর্যের বাসনায় হিন্দীর অনুকরণ করেন নাই। তবে ভারতচন্দ্র, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মাধুর্যহেতু, তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ বৈষ্ণব কবির গান। (নবজীবন, কার্তিক ১২৯১)

সৌন্দর্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির ক্রমশঃ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

সৌন্দর্যস্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিঃশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন কি আর ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্যই সেই দৈববাণী। কদম্বফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর;—বসন্ত তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চমতান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে? জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন - "তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস।" এই জন্য আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা

যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই—সংসারের আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এইজন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চিরবিরহে কাল কাটাই। কানে একটা বাঁশীর শব্দ আসিতেছে ; মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাইনা, সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

এই বাঁশীর ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্যে স্বর্গ মর্ত্যের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ছন্দ। ১৩৩০

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল," তখন এই বলার মধ্যে খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন,

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।—

তখন কথা থেমে গেলেও, বলা থামে না।

এ-বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে-দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে-দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তথ্য ও সত্য। সাহিত্যের পথে ; ১৩৩১

কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে

প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি। জ্ঞানদাসের একটা পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল॥

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার আছে, রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। তার চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন্ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কি উপায়ে। যারা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটাই বুঝতে হবে যে, শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে।

জিতেন্দ্রলাল বসু॥ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস। (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, ১৩।৯)

জ্ঞানদাসের রাধাচরিত্র আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমন্বয় হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধিকা রসিকা, চঞ্চলা, সরলা, স্ফুটিতমাত্রযৌবনা, প্রণয়রসমুগ্ধা, দৈহিকসুখপ্রিয়া নায়িকা—চণ্ডীদাসের রাধিকা যৌবনে যোগিনী মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীনা। চণ্ডীদাসের রাধিকার দেহ আছে তাহা বুঝিবার যো নাই, মন ও ভাব স্বতঃবিকশিত। বিদ্যাপতির শ্রীরাধা লালসাময়ী, চণ্ডীদাসের রাধা পাগলিনী। এই কারণে বিদ্যাপতির রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন—আর চণ্ডীদাসের রাধিকার সম্ভোগে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্য। জ্ঞানদাসের রাধিকা ভাবময়ী, পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের রাধিকার মতো বেদনাময়ী, কিন্তু দেহ বুদ্ধিহীনা নহে; এইজন্য সম্ভোগে আনন্দময়ী ও ভাবময়ী বৈচিত্র্যানুসন্ধানময়ী। মিলনেই কবি রাসলীলা, দোললীলা, ঝুলন প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা

কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার মত তীব্র লালসাময়ী নহেন, তাই বিরহে তাঁহার বিদ্যাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা নাই। বিদ্যাপতির রাধিকা বিরহে অনুক্ষণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিতে 'ভেল মাধাই'; চিন্তার এমন প্রখরতা আমরা জ্ঞানদাস বা চণ্ডীদাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গ লিপ্সা ছিল বলিয়া বিরহে তাঁহার হৃদয়ে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা অপেক্ষা বেদনার প্রাখর্য আছে। এইরূপে জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র রায়॥ জ্ঞানদাসের পদাবলী। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১২)

বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চ। বহু মনীষী সমালোচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী সার্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণ মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না। স্বর্গীয় হেমবাবু ও নবীনবাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির দুইজন কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় উত্তর দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব, তাঁহারা কে কোন শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক হয়; উহা মীমাংসিত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সমসাময়িক কবি ছিলেন, নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের বর্ণনায় আমরা উভয়কেই তদানীন্তন অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন সহকারে খেতুরির শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষাসাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শে পদরচনা করিয়াছেন; তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতির—বিশেষতঃ জয়দেবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে, তাঁহার পদসমূহে নান্নুরের স্বভাবকবি চণ্ডীদাসের প্রভাবই সুপরিস্ফুট। গোবিন্দদাস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব অনুকরণে সুললিত অনুপ্রাস-যোজনা, পদমাধুর্য, ও অলঙ্কার-চাতুর্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও প্রীতির উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপূর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলির প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ন্যায় অমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গালা পদ দুই চারটি পাওয়া গেলেও, সেইগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের—

দেখরে সখি শ্যামচন্দ ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ গাওয়ে রাগ-মালিকা॥
মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী॥

প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের—

"দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥...

ইত্যাদি সরল, মধুর, গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা স্থল সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল। সুতরাং গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি পদাবলী অনুপ্রাস, পদলালিত্য ও অলঙ্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয়

বলিয়া স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি—উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদরচনার জন্ত বাঙ্গালাভাষার গীতিকবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান নির্দেশ করিলে কোনরূপেই অসঙ্গত হইবে না।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ জ্ঞানদাস। (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১৩৬২)

বৈষ্ণবকবিকুলের মধ্যে, আধুনিককালে লিরিক-প্রতিভা বলিতে যাহা বুঝি, তাহা যদি কাহারও থাকে, তবে জ্ঞানদাসের। জ্ঞানদাসের গাঢ় গভীর অনুভূতির আকুতি ছিল এবং জ্ঞানদাস জানিতেন কেমন করিয়া সেই অনুভূতিকে সংহত তীব্র আকারে প্রকাশ করিতে হয়। অনুভূতির গভীরতার দিক হইতে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, কবিতার রূপবিলাস ও মণ্ডনকলার বিচারে গোবিন্দদাসের আসন জ্ঞানদাসের উর্ধ্বে। কিন্তু এই উভয়ের সমন্বয়—রূপ ও রসের যথাযথ মিশ্রণ ও তদ্দারা কাব্যমূর্তি গঠনের প্রতিভা জ্ঞানদাসে যেরূপ তাহা যদি স্পর্ধা বিবেচিত না হয় বলিব, অন্যত্র দুর্লভ। অনুভূতির অতি-গভীরতা এবং কুলপ্লাবী উন্মাদনা সাধকোচিত ভাবাঙ্গ-সৃজনে অক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়া চণ্ডীদাসকে অনেকাংশে মিষ্টিক কবি করিয়া তুলিয়াছে এবং ভাব-ব্যতিরেকেই বহুতর ক্ষেত্রে অনুপম প্রকাশভঙ্গীর অনুশীলন ও তাহার অভিব্যক্তির পরীক্ষা গোবিন্দদাসকে রূপদক্ষ আলঙ্কারিকতায় প্রায়শঃ আত্মতুষ্ট রাখিয়াছে। ঐ ঐ কবির প্রতিভার নিজস্বতার দিক অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর রস ও রূপপ্রতিভার পদতলে প্রণতি জানাইয়াভাব ও বাণীর যে কাব্যপ্রয়োগ জ্ঞানদাস রচনা করিয়াছেন, নিম্নতর ক্ষেত্রে বলরামদাস ছাড়া তাহার অনুরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্যে নাই। তুলনা করিয়া বলিতে গেলে, চণ্ডীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দ-দাসের হীরক-কাঠিন্যও তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণ্যকে অনায়াসবন্ধনে বাঁধিয়া অতি চমৎকার মুক্তাহার রচনায় গৌরব তাঁহার প্রাপ্য।...

পদাবলী সাহিত্যে দুই শ্রেণীর পদকার আছেন, এক শ্রেণী মূলতঃ বস্তুবিদ্ধ অথবা রূপ-তন্ময়। তাঁহাদের কাব্যে যেখানে ভাবের কথাও আছে, তাহা বিভাবাদির হৃদয়ভাব। শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে দূরত্ব বজায় আছেই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর কবি। আবার অন্য এক শ্রেণীর পদকর্তা আছেন যাঁহারা মূলতঃ ভাববিদ্ধ—প্রাণ-তন্ময়। তাঁহারা যখন কথা বলেন, রাধার মুখে বলিলেও তাহা ঐ কবিদের নিজের কথাই থাকিয়া যায়। সে সময় রাধার মুখের বাণী নিত্যকালের বাণী হইয়া উঠে এবং সেই নিত্যকালের বাণীকেই কবি রসসৃষ্টির বিশেষ কৌশলে নিজস্ব করিয়া লন। রাধা যে কথা বলিতেছেন অনুরূপ অবস্থায় যে কোনো নারী তাহা বলিতে পারে, রাধার কথার মধ্যে 'বিশেষত্ব' কিছু নাই, তাহা ভাবে ও রসে সর্বজনীন। এই সর্বজনীন আনন্দ বেদনার ভাষাটুকু যাঁহারা বৈষ্ণব কাব্যে আবিষ্কার করিয়াছেন. তাঁহারা হইতেছেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের তুলনায় এই দুই জনের মগ্নয়তার অন্যতম প্রমাণ, ইঁহারা যে সব রূপকল্প ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই ইঁহাদের স্ব-ভাবিত। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস চিত্র বা উপমা ব্যবহারে অতিশয় আলঙ্কারিক। আপনাকে নিরপেক্ষ রাখিয়া যখন রূপলোক নির্মাণ করিতে হইতেছে, যে রূপলোক আবার রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—সেখানে প্রাকৃত জীবন হইতে কাব্যবস্তুকে দূরে রাখিবার জন্য প্রাচীন কবি-ব্যবহৃত উপমা উৎপ্রেক্ষার শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রতীক ধর্মই রাধাকৃষ্ণ-লীলার উপর অপার্থিবতার ব্যঞ্জনা আরোপ করিতে পারে। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের হৃৎমর্মেই রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন। চক্ষু বা মন দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া কবি যখন দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগ অনুরাগের সুর লাগিবেই—অভিনব রূপকল্পনার প্রাচুর্ভাব ঘটিবেই।

এই স্বকীয় উপলব্ধির ব্যাপারে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস তুলনীয়। তন্ময়তা উভয় কবিরই ছিল, এবং ব্যক্তিগত হৃদয়োত্তাপ তাঁহারা কাব্যে

সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। তথাপি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কাব্যের পরিণতির ব্যাপারে। উভয় কবি একইভাবে কাব্য আরম্ভ করেন কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের সমাপ্তিতে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এমনই নির্বিশেষ করিয়া ফেলেন যে, শেষপর্যন্ত তাঁহার কাব্যরূপ অনেকাংশে শিথিলতা পায়। চণ্ডীদাসে যে পরিমাণ গভীরতা ছিল, সেই পরিমাণে রূপসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না, অথবা তাহা যদি সত্য নাও হয়, রূপকে বজায় রাখিবার বাসনাই তাঁহার ছিল না। চণ্ডীদাসের কাব্যের বিচ্ছিন্ন পঙক্তি রূপের ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্র সৃষ্টি করিয়া একাকারের ভাবপ্লাবনে আত্মহারা হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি মিষ্টিক। "চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর"—এই ধরণের খাঁটি রোমান্টিক রসানুভূতি কবি অল্পক্ষেত্রেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে অতিক্রম করিয়া এক অতীন্দ্রিয় ভাবাকুলতায় প্রাণসমর্পণ করিতে তাঁহার কাব্যের রূপরহস্য নয় – অপার্থিব ভক্তি-প্রাণতাই জয়যুক্ত হইয়াছে। "বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে মহাযোগিনীর পারা"—ইহা চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল ভাব। 'আক্ষেপানুরাগে', 'আত্মনিবেদনের' ভক্তিস্তোত্রে তাঁহার প্রতিভার বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছে। জ্ঞানদাসের মধ্যেও ভক্তিপ্রাণতা আছে সত্য, এবং তাঁহার আত্মনিবেদনও চমৎকার। তথাপি জ্ঞানদাসের কাব্য মিষ্টিক হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার কাব্যের একটি মূল ধর্ম—আমার মনে হয়—রোমান্টিকতা। রোমান্টিক রহস্যময়তায় জ্ঞানদাসের কাব্য পূর্ণ। এই রহস্যময়তাটুকু তাঁহার নিজস্ব সম্পদ, তাবৎ বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবি-ধর্মের সহিত জ্ঞানদাসের পার্থক্য এইখানে। জ্ঞানদাসের মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট কিছু—তাহা আধ্যাত্মিক হইবার প্রয়োজন নাই—আভাসিত করিবার শক্তি ছিল। তিনি বুঝিতেন কোথায় থামিতে হয়, কোথায় থামিলে পাঠকের ভাবাকুল হৃদয়ে নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করিয়া অসমাপ্তকে আপন মনে সমাপ্ত করিয়া লয়। একটি উদাহরণ লইলে জ্ঞানদাসের

এই স্বতন্ত্র শক্তিটুকুর প্রকৃতি ধরা পড়িবে। পূর্বরাগের এক পদ আরম্ভ হইতেছে,—

> আলো মুঞি জানো না সই জানো না
> জানো না গো জানো না।

—এ কাহার ভাষা? একই কথা আকুলভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরম অনুনয়ের সুরে প্রকাশ করিতেছেন যিনি, তিনি বাহ্যত: হয়ত রাধিকা, আসলে স্বয়ং কবি।

এ যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে,—এক রোমান্টিক কবির কণ্ঠে,—স্পন্দমান হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অকারণ অনুনয়ের সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। ঐ ব্যাকুলতার একটা বাহ্য কারণ কবি দেখাইয়াছেন, সে কারণটুকু কোন মতে যথেষ্ট নয়,—জানো না সই জানো না, জানো নাগো জানো না'—এই সঙ্গীত, এই সুর কারণহীন আবেগে জাগে।

কৃষ্ণ কদম্বতলে দাঁড়াইয়া আছেন—রাধিকা বলিতেছেন, তাহা জানিলে ঐ স্থানে যাইতাম না,—এই হেতু নির্দেশই কি ঐ সুরময় বাণীর, গুঞ্জন-ধ্বনির, শেষ কথাটুকু বলিয়া দিয়াছে, না রাধিকা অর্থাৎ কবি বলিবার আনন্দেই বলিতেছেন—জানো না সই জানো না……"। ইহার পর যে চারটি পঙক্তি আছে তাহা সাহিত্যের গৌরব হইতে পারে :—

> রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
> যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
> ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
> অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥

এ কোন্ যুগের কবি-বাণী? এমন করিয়া বলা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারো পক্ষে আমাদের দেশে সম্ভব কি? সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর পূর্বে জ্ঞানদাস এই কবিভাষা আবিষ্কার করিলেন কিভাবে? আত্যন্ত রোমান্টিক না হইলে কাহারও লেখনীর মুখে এই বাণী আসিতে পারে

না। নিতান্ত আধুনিক কালের কবিভাবনার মধ্যেই ইহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছি। রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া গিয়াছে, যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল,—আধুনিক কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ হারাইবার কথা শুনিয়াছি বটে। 'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ', —এ পথ যে কেন ফুরায় না, কেমনই বা এই পথ, এ পর্যন্ত কেহ সে কথা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই অথচ বলিতে ছাড়ে নাই; না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না-থামার আনন্দ—ইহা বিমিশ্র অনুভূতির যে কলতান অন্তরে বাজাইয়া তোলে তাহাতে— 'অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ'—না জানিবার রস-রহস্য বিলাসেই যুগে যুগে কবি-চিত্ত উল্লাস-মথিত।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ (জ্ঞানদাসের পদাবলী, ১৩৬৩)।

জ্ঞানদাস বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আজিকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির দিনেও বাঙ্গালী কবিসমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য পূর্ববর্তী কালে যেমন চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, শ্রীচৈতন্য পরবর্তী দিনে তেমনই জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। পদগুলি আলোচনা করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালাই তাঁহার নিজস্ব ভাষা, জ্ঞানদাস বাঙ্গালা ভাষার কবি। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলিকেও কবিত্ববর্জিত বলিয়া মনে হয় না। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা, বৈষ্ণব কবিগণের সৃষ্ট ভাষা। যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন এবং রায়শেখর শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক। ইহাদের হস্তে মার্জিত ও সজ্জিত হইয়া ব্রজবুলি বাঙ্গালী কবি তথা জনসাধারণের মনোহরণ করে। কবিগণ ব্রজবুলিতে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। অনেক অক্ষম কবি যশের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। জ্ঞানদাস কিন্তু এই অক্ষম কবিগণের শ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনি আপন প্রয়োজনেই বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাকেই

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে রচিত সকল কবিতায় অভ্যস্ত হস্তের সাবলীল নৈপুণ্য নাই।

জ্ঞানদাসের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কয়েকটি কবিতা ভাবের গভীরতায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ছন্দ-সৌন্দর্যে ও শব্দ-মাধুর্যে, মিলের সৌকর্যে ও গঠন কারুকার্যে অনুভূতির প্রখরতায় ও বাচংযমতায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়াছে। ব্রজবুলিতে কবির ভাষা সংযত কিন্তু সর্বত্র তেমন সুসমঞ্জস নহে। রসের উচ্ছলতা আছে, কিন্তু অনেক পদেই ভাবের তেমন গভীরতা নাই। ছন্দও প্রায় স্বাচ্ছন্দহীন এবং মিলের পারিপাট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কথাটা সাধারণ ভাবেই বলিতেছি। কারণ জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার মধ্যেও দু-চারটি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে।

আমার মনে হয়, কবির বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদে ভাবের আবেগে ভাষা যেন স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে। শব্দচয়নের জন্যও যেমন তাঁহাকে কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তেমনই কি কথা বলিবেন তাহার জন্যও চিন্তার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। কিন্তু যেখানে এক কথা বলিতে আর একটা কথা মনে হইয়াছে, সাত পাঁচ ভাবনায় মন যেখানে চঞ্চল, প্রাণ অস্থির, সেখানেই কবি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে, জ্ঞানদাসের রচনায় এরূপ প্রথা রক্ষার, গতানুগতিকতার, অথবা কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিমানবিহারী মজুমদার ॥ জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা। (রেনেসাঁ। ১৩৬৮)

জ্ঞানদাসের পদগুলি মন দিয়া পড়িলে বুঝা যায় যে তিনি সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া কাব্যসাধনা করিয়াছিলেন। অনেক রকমের কাব্যরীতি লইয়া তিনি গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি পদে বিদ্যাপতির ছাপ সুস্পষ্ট। আবার কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের কবিশৈলীর অনুকরণে

লেখা। কিন্তু অধিকাংশ পদই তাঁহার নিজস্ব কবিপ্রতিভার জ্যোতিতে ভাস্বর। সেইজন্য মনে হয় যে তাঁহার কাব্যসাধনা তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি অল্পবয়সে সাদাসিধা কাহিনী লিখিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। তাহার নন্দোৎসবের পদগুলিকে কবির প্রথম যুগের রচনা বলিয়া ধরা যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলীর' মতন এগুলিতেও যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুদিন ধরিয়া সাদাসিধা কাহিনী রচনা করিয়া কবি আলঙ্কারিক রীতিতে পদ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন তাঁহার অনুকরণ করিবার মতন অল্প বয়স। শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক কবি বিদ্যাপতি হইলেন তাঁহার আদর্শস্থানীয়। ছোট ছেলেরা যেমন পাকা হাতের লেখার উপর দাগ বুলাইয়া হাতের লেখা অভ্যাস করে, জ্ঞানদাসও তেমনি—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥

চরণ দুটি বিদ্যাপতি হইতে লইয়া বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির উপমা চাতুর্য তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে "জগমাহা উপমা করই না পাই"। বিদ্যাপতির রাধিকার 'উরজ উদয় থল লালিম দেল' দেখিয়া জ্ঞানদাস লিখিলেন—'উলসল উরথল অব ভেল রে' কিন্তু বিদ্যাপতি যেখানে ব্যঞ্জনাপূর্ণ 'চঞ্চল চরণচিত চঞ্চল ভান, লিখিয়াছেন, জ্ঞানদাস সেখানে গদ্যময় "গতি অতি তুরিত সমাপন রে। শৈশব কয়ল পয়ান রে" বলিলেন। বিদ্যাপতি 'লোমলতাবলি'কে যেন 'ভুজগ নিশাস পিয়াসা' বলিয়া অনুপম কবিত্ব করিয়াছেন। জ্ঞানদাসও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া 'রোমলতা ভুজগি ভান' বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন 'অছইতে আছল কাঞ্চন পুতলা। এবে ভেল বিপরীত ধামর দেহা'॥ জ্ঞানদাস উহারই অনুসরণে লিখিলেন—'সহজে লুনিক পুতলি গোরি।

ঝারল বিরহ আনলে তোরি ॥' জ্ঞানদাসের 'কমল রমণী কনক কাঁতি' ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত পশু ও উদ্ভিদ জগতের নানারকমের বস্তু ও প্রাণীর উপমা বিদ্যাপতির 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল' অনুকরণে লেখা। জ্ঞানদাস রাধার বিরহ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

ইহা বিদ্যাপতির প্রতিধ্বনি। 'দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লুঁ বিছুরল গোকুল নাম'। বিদ্যাপতির অনুসরণে জ্ঞানদাস লাথ বা তুলনার (প্রহেলিকা) পদও রচনা করিয়াছেন।···

বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিবার যুগেই জ্ঞানদাস ব্রজবুলি মিশ্রিত পদগুলি রচনা করেন। ব্রজবুলি মিশ্রিত পদগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত রচনার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। এই শ্রেণীর খুব অল্প পদেই ব্যঞ্জনার ও ভাবচিত্রণের চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বোধহয় এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া চণ্ডীদাসী রীতিতে পদরচনায় মনোনিবেশ করেন। চণ্ডীদাসের পদে উপমার বাহুল্য নাই; যে দুই-চারিটি উপমা আছে তাহাও নিতান্ত ঘরোয়া। সহজ ভাষায় সরলভাবে প্রাণের কথাটি চণ্ডীদাস এমনভাবে বলেন যে, তাহা একেবারে মরমে যাইয়া বিঁধে। জ্ঞানদাস ঐ রীতিটি আয়ত্ত করিবার সাধনায় রত হন। চণ্ডীদাসের অনেক সুপ্রসিদ্ধ উক্তির প্রতিধ্বনি জ্ঞানদাসের পদাংশে পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস বলেন, 'কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই, চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নাই" ইহা চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত উক্তির ভিত্তিতে লিখিত—

গৃহকাজ করি শুমরিয়া মরি
ফুকরি কান্দিতে নারি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী ॥

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—'দোসর ধাতা পিরিতি হইল। সেই বিধি মোরে এতেক কৈল'॥ জ্ঞানদাসও বলেন—'সই পিরিতি দোসর ধাতা। চণ্ডীদাসের পদের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার জ্ঞানদাসের নিম্নলিখিত পদ্যাংশে পাওয়া যায়—'বাদিয়ায় বাজি যেন তোমার পিরিতি হেন' 'কি আর বুঝাও কুলের ধরন' 'পিরিতি মিরিতি তুলে তোলাইনু পিরিতি গুরুয়া ভার, 'আগে আহার দিয়া মারয়ে বাঁধিয়া' 'কুলিন সাপিনী যেন গরল উগারে' আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশের এই ধারাকে স্বীকার না করিলে বলিতে হয় যে, তিনি খেয়াল খুশিমত কখনও চণ্ডীদাসের অনুসরণে সাদা বাংলায়, কখনও ব্রজবুলিতে, কখনও বা বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতিতে পদ লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে দেখা গিয়াছে যে, তিনি এক এক যুগে এক এক শৈলীকে অনুসরণ করিয়াছেন। 'মহুয়ার' যুগে মানসীর ভাষা ও ভাবের ব্যবহার দেখা যায় না।

বহু নিরীক্ষা পরীক্ষার পর জ্ঞানদাস তাঁহার স্বকীয় ভঙ্গী আবিষ্কার করেন। উহার প্রধান গুণ হইতেছে, অল্প একটু ইঙ্গিত করিয়া শ্রোতা ও পাঠককে বাকীটুকু কল্পনা করিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া। ভাবের আবেগে জ্ঞানদাস উচ্ছ্বাসময় কবিতা লেখেন নাই; সংহত ও ভাবঘন স্বল্পাক্ষর পদে তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে মুদ্রিত 'যাইতে যমুনা সিনানে, সঙ্গহি কাল সমানে' 'তুমি সব জান কানুর পিরিতি তোমারে বলিব কি' 'ভালই আছিলু আনমনে, প্রমাদ পড়িল সেইক্ষণে' 'কানু রহল পরদেশ'।

জলদসময় পরবেশ ॥' ইত্যাদি পদগুলি স্বল্পকথায় গভীর ব্যঞ্জনাময় উক্তির সুন্দর নিদর্শন। শ্রীরাধা তাঁহার অন্তরের গোপনতম কথাটি মরম সখীকে বলিতেছেন—

কি ঘর বাহিরে লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরীতি ॥

ঘরের লোক বাহিরের লোক সবাই গঞ্জনা দিয়া বলে—রাধার এ কি রকম ব্যবহার। কিন্তু রাধা জানেন যে, জীবন থাকিতে বন্ধুর প্রেমের কথা ভোলা অসম্ভব, লোকে যতই কেননা নিন্দা কুৎসা করুক রাধার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যে কৃষ্ণরসে কৃষ্ণ ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে। বাহিরের বিশ্বে কত জিনিসই না আছে, কিন্তু রাধার চক্ষু সর্বত্রই শ্যামকে দেখিতে পায়, শ্যাম ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। মুখে অন্য কথা বলিতে গেলেও শ্যামের কথাই বাহির হয়।

দেখিতে না দেখি আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান ॥

শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শ এমন সুন্দরভাবে অতি অল্প কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণের নিকট রাধার আত্মনিবেদনের ভাবই দেখা যায়। জ্ঞানদাসের পদে পাই, শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরও উপাসনার ধন হইয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বসন্ত রায় জ্ঞানদাসের অনুসরণ করিয়া এই ধরনের অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে ছয়টি পদের উল্লেখ করা যায়। তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছে—'আলো মুঞি জানো না জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে'। অবস্তুর সহিত বস্তুর, বাহিরের জিনিসের সহিত মানসিক অবস্থার উপমা প্রয়োগ করিয়া পদটি পাঠকের কল্পলোকে লইয়া যায়। রাধা একবার কৃষ্ণের রূপের পানে চাহিয়া

কেমন করিয়া মজিলেন, ডুবিলেন. তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে তিনি একবার বলেন, 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল, একবার বলেন, না না, ডুবিয়া যায় নাই, হারাইয়াই গিয়াছে, তাহার যৌবনের বনের মধ্যে মন একবার প্রবেশ করিয়াছিল, আর বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই; তাই তো রাধা ঘরে ফিরিতে পারিতেছেন না, যেখানে সেইরূপ দেখা দিয়াছিল তাহারই চারিপার্শে মন্ত্রমুগ্ধার মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহার মনে হইতেছে যে, ঘরে ফিরিবার পথ বুঝি আর ফুরাইবে না; ফুরাইবে কোথা হইতে? সে দিকে যে রাধা পদক্ষেপও করেন নাই। কৃষ্ণের কপালে চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকা ছিল, আর তাহার মাঝে মৃগকস্তুরীর একটি ছোট্ট টিপ—এটি যেন একটি ফাঁদ, তাহাতে চোখ দিতে যাইয়া রাধার পরাণ পুতলি যেন একেবারে বাঁধা পড়িল।

রূপানুরাগের আর একটি পদ 'চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ুর পুচ্ছ' ইত্যাদিতেও জ্ঞানদাসের উপমার অলৌকিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণের কালোবরণ, তাহার উপর বিচিত্রবর্ণের ময়ূরের পাখা, দেখিয়া মনে হয় যেন নবজলধরের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ শোভা পাইতেছে। সেই চূড়া আবার মালতীর মালা দিয়ে ঘেরা, মালতীর মালা যেন সুরধুনীর স্বচ্ছ ধারা আর শ্রীকৃষ্ণের মাথায় চূড়া যেন নীল-গিরির শিখর। কৃষ্ণের কপালে চন্দন আঁকা চাঁদ ও মাঝে ফাগুর বিন্দু, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন কৃষ্ণের কপাল বুঝি কালোজল, চন্দন বিন্দু যেন রূপার পাত, তাহাতে কেহ বুঝি আবীরের বিন্দুরূপ জবাফুল দিয়া যমুনাকে পূজা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সঙ্কলনে এমন সুন্দর পদটি কি জবাফুলের উল্লেখের জন্য স্থান পায় নাই?

রূপানুরাগের 'দেইখা আইলাম তারে' পদটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে দুইটি। প্রথমতঃ রাধার বিস্ময় বিমূঢ়তা—কেননা 'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে'; বিধাতা একই দেহে এত বিচিত্র রূপের সমাবেশ

করিয়াছেন, কিন্তু উহা দেখিবার জন্য চোখ দিয়াছেন মাত্র দুইটি। লক্ষ নয়ন থাকিলে এবং তাহাতে যদি পলক পড়ার উৎপাত না থাকিত, তাহা হইলে বুঝি ঐরূপ প্রাণ ভরিয়া রাধা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু যেটুকু তিনি দেখিয়াছেন তাহাতেই সোজা কবুল করিয়াছেন 'আমা হৈতে জাতি-কুল নাহি গেল রাধা'। এমন অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি চণ্ডীদাসের পদেও বিরল।

জ্ঞানদাসের 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' পদটিকে অতি আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। দৈহিক মিলনের অত্যুগ্র বাসনা অনাবৃতভাবে ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে—'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' কিন্তু মানুষ তো শুধু দেহ নয়, দেহ তো মনের কর্তব্যবশেই চলে। তাই পরের চরণেই রাধা বলিতেছেন —'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে'; বুকের ভালবাসার একটু ছোঁয়া পাইবার জন্যই রাধার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাঁহার পক্ষে আর ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে ঐ পদের প্রথম চারি চরণ উদ্ধৃত করিবার পর আর দুইটি চরণ ধরিয়াছেন—

গুরুজন পরিজন যতেক গঞ্জে।
রতন জ্বলে যৈছে তিমির পুঞ্জে॥

লোকের গঞ্জনায় রাধার দুঃখের কথাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন। কিন্তু সেই দুঃখের মধ্যেও যে একটা বড় রকমের সুখ লুকানো আছে তাহা, জ্ঞানদাসের সন্ধানী কবিপ্রতিভাই প্রথম আবিষ্কার করিল। গঞ্জনার অন্তরালে রাধার মনে হইতেছে আমার বন্ধুর জন্য আমি এর চেয়েও বেশী দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত—তাঁহার ভালবাসা যেন এই গঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে মণিমাণিক্যের মতন জ্বলিতেছে। এই অপূর্বসুন্দর চরণ দুইটি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে।

রাধার চিত্তের অসীম ব্যাকুলতার কথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধবে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানে রাধার মনের অবস্থাটি ছবির মতন ফুটিয়া

উঠিয়াছে। রাধা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য একবার বাহিরে যান, আবার গুরুজনের ভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু ঘরে স্থির হইয়া বসিতেও পারেন না, ঘরের কাজকর্মেও মন দিতে পারেন না। কৃষ্ণ-দর্শনের লালসা তাঁহাকে বারংবার ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়। আবার ঘরের ভিতর যখনই আসিতে হয় তখনই আক্ষেপ জাগে যে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই। থাকিলে কি এমন করিয়া প্রিয়তমকে দেখিবার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেন।

জ্ঞানদাস শুধু মনের ভিতরকার আলোড়নই শব্দে চিত্রিত করিবার কৌশল আয়ত্ত করেন নাই, বাহিরের কলরোলও ভাষায় আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগে তাঁহার নৈপুণ্য দেখা যায় মানসগঙ্গার নৌকাবিলাসের পদে।

> মানসগঙ্গার জল ঘন করে কলকল
> দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
> গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
> তরণী রাখিতে নারে কেউ॥

ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা, মেঘ ও বাতাসের আবির্ভাব, নৌকার অসহায়তা সব কিছু অতি দ্রুত বেগে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গতির রূপ যে ভাষায় এমন করিয়া মধ্যযুগের কবি দিতে পারিয়াছেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এমন বিপদের মধ্যে নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায় রঙ্গরস আরম্ভ করিলেন। এইসব 'অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল পরাণ হৈল পরমাদ।'

জ্ঞানদাসের সবগুলি পদ আবিষ্কৃত না হইলে তাঁহার প্রতিভার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। এখনও বহুপদ অনেক পুঁথির ছিন্ন ভঙ্গুর ও পত্রের মধ্যে লুকাইয়া আছে।

জ্ঞানদাসের পদে আধুনিকতার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সেইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। কবি যখন বলেন "ঘর

গোবিন্দদাস। (জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮১)

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ধর্মবিপ্লবের পূর্ববর্তী এবং গোবিন্দদাস পরবর্তী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা অনেক অধিক। এই গোবিন্দদাস বৈদ্য-বংশ সম্ভূত। ইনি বিদ্যাপতির মৃত্যুর ৮৬ বৎসর এবং চৈতন্যের জন্মের ৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায়[১] (খ্রীঃ ১৫৬৭ অব্দে) বুধুরী গ্রামে পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে[২] জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমালায় এই কারণ ইহাঁর নাম গোবিন্দ কবিরাজ লেখা আছে।

গোবিন্দদাস অধিককালের লোক নহেন, সুতরাং তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে ভক্তমাল একমাত্র প্রমাণ নহে। মূল ভক্তমাল গোবিন্দ-দাসের বহু পূর্বে নভোজী কর্তৃক হিন্দীভাষায় বিরচিত। তবে গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জীবনচরিত যে ভক্তমালে দৃষ্ট হয়, তাহা আমাদিগের বিবেচনাতে আপনার সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রাধান্য বর্ধন হেতু পরবর্তী বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। আমরা রাজসাহী জেলাস্থ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের পুস্তকাগারে এক-খানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ গোকুলকৃষ্ণ সেন নামক জনৈক ভদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব কর্তৃক সংগৃহীত। ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ দুই সহোদর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শাদির্খার দিয়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩] সাদি খাঁ দিয়ার এবং তন্নিকটবর্তী স্থানে অদ্যাপি গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্রের সম্বন্ধে অশেষবিধ জনরব শুনা যায় এবং তথায় বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের আবাস ও গীতকাব্যের সমধিক চর্চাও এই বিষয়ের আনুষঙ্গিক প্রমাণ।

১। ভুল তথ্য। ১৪৫৯ শক বা ১৫৩৭ খ্রীঃ।

২। ভুল তথ্য। চিরঞ্জীব সেন।

৩। ভুল তথ্য। তেলিয়া বুধুরী গ্রামে জন্ম

রামচন্দ্র কবিরাজ রাঢ় দেশ হইতে বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে যাজিগ্রামের (শ্রীনিবাস আচার্যের স্থান) নিকটবর্তী কোনস্থানে তাঁহার সহিত আচার্য প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র আচার্যের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে এত বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তদ্দণ্ডেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং নবধর্মের উপর সমধিক অনুরাগী হইলেন। গোবিন্দ এক্ষণ পর্যন্তও কালী উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ ইষ্টদেবীকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

কথিত আছে, মহামায়াও তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধাতে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, পূজা সময়ে স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। একদা গোবিন্দ গৃহমধ্যে পূজা করিতেছিলেন, এবং রামচন্দ্র গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। সে দিবস অনেক স্তবস্তুতি করিয়াও গোবিন্দ ইষ্টদেবীর আবির্ভাব দেখিতে পান না। গোবিন্দ নিতান্ত অধীর হইয়া মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কালী গৃহের বাহির হইতে উত্তর দিলেন,'গৃহের দ্বারে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছে, তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার গৃহপ্রবেশের ক্ষমতা নাই'; গোবিন্দ ইষ্ট দেবীর মুখে ঈদৃশ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন, এবং তদ্দণ্ডেই উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

উপযুক্ত বাক্য সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে যে, গোবিন্দদাস প্রথমতঃ কালীর উপাসক ছিলেন।

গোবিন্দদাস ৭২ বৎসর[৪] বয়ঃক্রমে ১৫৬১ শকাব্দায়[৫] (খ্রীঃ ১৬৩৯ অব্দে) পদ্মানদীর তীরস্থ খেতর নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থের নাম 'পদমালা'। গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের পরবর্তী; সুতরাং গৌরাঙ্গের বিষয়ক অনেক কবিতা গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন।...

৪. ভুল তথ্য। ৭৬ বছর বয়সে

৫. ভুল তথ্য। ১৫৩৫ শক বা ১৬১৩ খ্রীঃ—সম্পাদক

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের রচনা অনেকস্থলে অনুপ্রাসময়ী ; এ বিষয়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন। স্থলে স্থলে বিলক্ষণ রচনাচাতুর্যও দেখা যায়।

গৌরেন্দ্রমোহন গুপ্ত ॥ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কবি ; গোবিন্দদাস।

(প্রদীপ, ১৩১২)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দদাসই পদকর্তাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অবশ্য গোবিন্দদাস বলিতে এস্থলে আমরা গোবিন্দদাস কবিরাজের কথাই বলিতেছি।

গোবিন্দদাসের কবিতায় বিদ্যাপতির অনুকরণের ছায়া পড়িয়াছে। তথাপি তাঁহার মৌলিক কাব্য শক্তিরও অভাব ছিল না. গোবিন্দদাসের কাব্যধারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর, মধ্যাহ্নলীলা, নৌকাবিহার, দানলীলা, রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণরাধিকার রূপ, নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ মিলন সম্ভোগ, বাসকসজ্জা, মানবিরহের বিবিধ চিত্রে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন চরাচরের জন্য বৈকুণ্ঠের অমৃত ও সৌন্দর্যের উৎস খুলিয়া গেছে।…

ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং ভাবের গভীরতায় গোবিন্দদাস তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শব্দবৈভবের সীমা ছিল না। তিনি অনেকগুলি পদ একটি আদ্য অক্ষরের কথা দিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাহাতে ভাব শব্দশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার কতকগুলি যুক্ত শব্দচিত্র আমি এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি. অবশ্য ইহার মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাপতি পূর্বে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহা হইতে তাঁহার শব্দবৈভবের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা :—

জলধর শ্যামর অঙ্গ ; ললিত ত্রিভঙ্গ ; জগজনমোহন ; তরুণ-অরুণরুচি ; জগজনলোচনচান্দে ; তরলনয়ানী ; রঙ্গিনী-ভাঙ্গ-ভুজঙ্গিনী ; রতনমঞ্জরী ; তনুবল্লরী ; শারদইন্দুমুখীবালা ; হরিণনয়ানী ; মন্মথরঙ্গ-

তরঙ্গিতলোচন ; দিঠিপঙ্কজ ; কমলবয়ান ; নীলউৎপলদামশ্যামর ; মঞ্জুলমাধবীকুঞ্জ ; হিয়াপিঞ্জর ; হরিঅভিসাররভসরসে ; বিরহজলধি , বিরহহুতাশ ; আকুলকণ্ঠ , জগমনোহারী ; গজগামিনী ; মঞ্জীররঞ্জিত ; মন্মথমনমোহনিয়া ; অমিয়মধুরভাষা ; ভুরুধনুসন্ধান ; সিন্দূরতরুণ-অরুণরুচিরঞ্জিত ; করকিশলয় ; নয়নরসায়ন ; প্রাতরধূসরশশধরকাঁতি ; কুলবতীচিতচোরণি ; অরুণবচনবিশিখ ; চলতচিত্রগতি ; নয়নতরঙ্গ ; হৃদয় অনুবন্ধ ; পুলককদম্বকরম্বিত অঙ্গ ; শিথিলমান ; সখিনীসমাজ ; বয়বিধুরয়নী ; বিপিনবিতান ; নীলসরসিজশ্যামরবয়না ; জনমনমথন ; পুলক পটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ ; মঞ্জীররঞ্জিত ; ভ্রমর করম্বিত ; বিগলিত নীবিনিবন্ধ।

শব্দদ্বৈত যথা ঃ—

মধু পিবি পিবি উতরোল ; লহু লহু হাসি ; হৃদয় গরগর ; গদগদ ভাষ ; ঢরঢর নয়ন ; দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ ; নয়নপঙ্কজ ঝুরে ঝরঝর।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ যথা—

মধুকর ঝঙ্করু ; কিঙ্কিনীমণিকঙ্কণ ইত্যাদি।

কবিতার এই মন্দাকিনী ধারা, এই প্রেমের উৎস বৈকুণ্ঠের দিকে ছুটিয়াছে কবির প্রাণের দেবতার মন্দির সংসারের বহু ঊর্ধ্বে, যেন স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে। তাহাতে পরম পুরুষ ও রাজরাজেশ্বরী লীলা করিতেছেন।

বৈষ্ণব কবির কাছে এই প্রেমবৈচিত্র্যময় সংসারে পূর্বরাগ, মান, মাথুরবিরহ মিলন লইয়া অপূর্ব লীলার সমাবেশ! গোবিন্দদাসেরও রাধিকার পূর্বরাগ হইতে মাথুর পর্যন্ত, সব দুঃখ কষ্ট, সব অপমান, তিনি সুখের উপাদানই মনে করিয়াছিলেন। ননদীর গঞ্জনায় দারুণ মনোকষ্টের ভিতরও নায়কের নামোল্লেখমাত্র অপূর্ব সুখের সঞ্চার করিয়া দিত। অভিসার পথের কণ্টকক্ষত চরণক্ষরিত রক্তধারা তাঁহার সুকুমার রাতুল চরণ যুগলে অলক্তক রাগরঞ্জিত করিয়া দিত। তথাপি

বিদ্যাপতির রাধিকার মত দারুণ অভিশাপ কিংবা কঠোর অভিমান নাই। এমন সংযত প্রেমের চিত্র বিদ্যাপতির কাব্যে দুর্লভ। গোবিন্দদাসের প্রেম ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; প্রেমে অভিমান লয় হইয়া গিয়াছে।

কবির মনোবৃন্দাবন প্রেমে এ মিলনের মধুধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে। বর্ষায়, শরতে, বসন্তে, হেমন্তে, শীতে, মিলন বিরহ, পূর্বরাগ, মান অভিমানে, প্রতিভার প্রতি কল্পনাকে যেন অপূর্ব শোভা মণ্ডিত করিয়া নিজ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি মহাভাবের অনন্ত প্রবাহে ফেলিয়া দিয়াছেন; সমস্ত সৌন্দর্য 'যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরছয়ে কত কোটি কাম', সেই জীবনেশ্বরের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন। সে সৌন্দর্যেরও শেষ নাই, সে কবিত্বেরও সীমা নাই, সে মিলনেরও ভাষা নাই, ইহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের কাব্য তাঁহাদের বুঝান কঠিন হইবে না।

জিতেন্দ্রলাল বসু॥ গোবিন্দদাস। (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, ১৩১৭)

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে কবি গোবিন্দদাস প্রথ্যাতনামা। কিন্তু আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি না যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী বলিয়া যতগুলি পদ প্রচলিত আছে, সকলগুলিই একই কবির রচিত। বৈষ্ণব কবির আদিগুরু জয়দেবের আদর্শে গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দদাস তাঁহার পদাবলীর ভিতর একটু মধুরতা, একটু গঠন পারিপাট্য, একটু কোমল-কান্তি আনিবার জন্য যেন সর্বদাই চেষ্টা করিয়াছেন। মসৃণ পেলবতায় তাঁহার পদাবলী সদাই যেন সমৃদ্ধ। জয়দেবের অনুকরণে তিনি প্রথমেই কোমলকান্ত পদের দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন, তাহা জয়দেবের গীতির ন্যায় মধুর—

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতম্।
ব্রজবনিতাকুচ কুঙ্কুম ললিতম্॥

বন্দে গিরিবর ধর পদকমলম্।
কমলাকর কমলাঙ্কিতমমলম্॥

ইত্যাদি পদে যে ললিত সুর উঠিয়াছে সেই সুর প্রায় তাঁহার সকল কবিতাতেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই মধুর ঝঙ্কার, এই সুরের বৈচিত্র্যময়ী ভঙ্গী কবি গোবিন্দদাসের নিজস্ব। বাঙ্গালা গীতিকবিতায় ছন্দো বৈচিত্র্য ও রচনাবিন্যাসকৌশল তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব সংস্কৃত রচনার যে অপূর্ব ভঙ্গীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই অপূর্ব ভঙ্গী বঙ্গভাষায় কবি গোবিন্দদাস প্রথম আমদানি করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কোকিলের পঞ্চম তান, বীণার কোমল নিক্কণ নিয়ত বিরাজিত। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে 'চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ'। গোবিন্দদাস ভারতচন্দ্রের পূর্বপিতামহ। যে ছন্দ ও ভাষা ভারতচন্দ্র গোবিন্দদাসে পাইয়াছিলেন তাহাই তিনি মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিয়া নিজ প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী; তাঁহার নির্মিত ইমারত কোথাও দেখিতে কুৎসিৎ নহে, সকল স্থলেই সুদৃশ্য। ভারতচন্দ্রের সহিত এই স্থলেই তাঁহার সাম্য; কিন্তু গোবিন্দদাস শুধু শিল্পী নহেন, তিনি কবি। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার বৈষম্য। যে সরস কবিত্বে গোবিন্দদাস অনুপ্রাণিত ভারতচন্দ্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের কবিত্ব ও ভারতচন্দ্রের কবিত্ব বিভিন্ন জাতীয়। ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব কোথায় তাহা অনেকে বলিয়াছেন—সে কথার অবতারণার এখানে প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু গোবিন্দদাসের কথাই বলিব।

কবি গোবিন্দদাস সকল বৈষ্ণব কবির মত রূপবর্ণনায় সুপটু; অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির মত তিনি প্রিয়তমের মুখে প্রিয়তমার ও প্রিয়তমার মুখে প্রিয়তমের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এমন স্থলে একটু আধটু অত্যুক্তি সহজেই আসিয়া পড়ে; তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই যে

প্রিয়জনকে সর্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্যের আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ইহাই ভালবাসার সাধারণ ধর্ম। তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা গোবিন্দদাসের ইষ্টদেবতা; সেই ইষ্টদেবতার রূপ বর্ণনা করিবার কালে তিনি সকল সময় আত্মসংযম রাখিতে পারেন নাই, মধুময়ী কল্পনার সাহায্যে তাঁহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি ধারণা করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে সজীবভাবে চিত্রিত করিয়াছে। ভক্তের ভগবৎমূর্তি কল্পনা ও তাহার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গোবিন্দদাস শুধু রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন নাই, শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর রূপও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী এবং তাঁহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা—'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরানী।' গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এইভাবেই দেখিয়াছেন, এবং ভক্তিবিগলিত প্রাণে ভগবান ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে এই হৃদয়োন্মাদক ভাবে ভাবিয়া নিজ ভক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব নায়ক ও নায়িকাশিরোমণির রূপ কাজে কাজেই প্রথমে তাঁহাকে চিত্রিত করিতে হইয়াছে।

চণ্ডীদাস যে উপাদানে শ্রীরাধার প্রণয়োৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাসও সেই সেই উপাদান তাঁহার শ্রীরাধার প্রেমোৎপত্তির হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন :

পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।

ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ' এই অমৃতময় পদের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার মত পাগলিনী নহেন, বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার মত লালসাময়ী। গোবিন্দদাসের রাধা যোগিনীর পারা নহেন। তিনি লালসাময়ী সুন্দরী।

গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের চিত্রগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় স্নিগ্ধ। এই চিত্রে তাঁহার সহৃদয়তা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা একদিকে যেমন বিদ্যাপতির রাধিকার মত লালসাময়ী অপরদিকে তেমনি চণ্ডীদাসের রাধিকার মত প্রথম দর্শনাবধি প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়া। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেন নাই। আমরা যখন গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রথম শ্রীরাধার দর্শন পাই, তখনই তিনি প্রেমমুগ্ধা যুবতী নায়িকা।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার হৃদয়ে কৃষ্ণসম্ভোগলালসা যেমন প্রবল, কৃষ্ণের সহিত প্রেমও তেমনি প্রবল। গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণ শুধু উভয়ের রূপবন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ আছেন; দুইজনই দুইজনের 'প্রাণ লইয়া খেলা' করিয়াছেন। দুইজনেই দুইজনের রূপের উল্লাসে উন্মাদ প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ের পরস্পরের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা শুধু তাঁহার কাল্পনিক স্বপ্নমাত্র ছিল না। তাঁহারা যে মহাপুরুষের কাছে মধুর রসাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জগৎপূজ্য মহাপ্রভুর জীবনে এই সকল ভাব অহরহ স্ফুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

রা কহি ধা পঁহু কহই না পারয়ে
ধারা ধারি বহে লোর।
সোই পুরুখ মণি লোটায় ধরণী পুনি
কো কহে আরতি ওর॥

গোবিন্দদাস বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্র একটি জীবন্ত চিত্রের প্রতিচ্ছবি, কল্পনামাত্র নহে।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিকুলের প্রথামত মিলন সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় অনেকে অশ্লীলতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। এইখানে এইটুকু বলিলেই

চলিবে যে বৈষ্ণব কবির গান যদি কেবল পার্থিব প্রণয়ের গান বলিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এই সম্ভোগ চিত্রগুলি স্বাভাবিক বৈ অস্বাভাবিক নহে, তাহা মনুষ্যহৃদয়যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। ভালবাসার যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই বৈষ্ণব কবি বর্ণিত করিয়াছেন। শুধু বৈষ্ণব কবি কেন সকল মহাকবিরাই ইহাই বুঝাইয়াছেন। শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে গোবিন্দদাসের সম্ভোগচিত্র কেবল শারীরিক সম্ভোগ নহে, ইহাতে মনের অংশও অনেক পরিমাণে আছে। এগুলি ভারতচন্দ্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের সম্ভোগচিত্রের মত নির্লজ্জ শারীরিক মিলনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা সঞ্জাত নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক আলিঙ্গনের চিত্র নহে।

কবি গোবিন্দদাসের মন এ সকল বর্ণনার কালে কোথায়? তাঁহার দৃষ্টি কি নিতান্ত নীচ প্রকৃতি পরিচালিত হইয়া এই অপূর্ব যুগল মিলন দেখিয়াছে? যাঁহারা অত্যন্ত অন্ধভাবে বৈষ্ণব কবির চর্চা করেন, তাঁহারাই এমন কথা বলিবেন। আমরা দেখিতে পাই যে মিলন সম্ভোগ বর্ণনা কালেই যেন কবির চিত্ত আরও ভক্তিবিধৌত হইয়াছে, সেই বর্ণনার কালেই কবির লেখনী আরও সংযত হইয়াছে, আর সেই সময়েই

চরণ বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস।

গোবিন্দদাসের সম্ভোগবর্ণনা কি জাতীয় তাহা তাঁহার 'রসোদ্গার' শীর্ষক কবিতা গুলিতে প্রকাশিত।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে গোবিন্দদাসের কবিত্ব এ সকল বর্ণনায় উছলিয়া উঠিয়াছে, তিনি আর এখানে শুধু শিল্পী নহেন, তিনি এখানে যথার্থ কবি। কত সুন্দরভাবে তিনি শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা একটি নূতন ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়াছে। তাঁহার ভাবপ্রকাশশক্তি অসীম, সরস ও জটিলতাদোষ শূন্য।

যথার্থ প্রেমের দৈন্য গোবিন্দদাস "মানের" চিত্রে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। মানের চিত্র প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিই আঁকিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দদাসে এ বিষয়ে একটু সরসত্ব আছে, একটা নূতন সুর আছে। বোধ হয় একথা বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেও মানের চিত্র এত সরস নহে। গোবিন্দদাসের মানের চিত্রে কতকগুলি চরিত্র বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও সখী চরিত্র। শ্রীরাধার চরিত্রও বেশ কোমলত্ব লাভ করিয়াছে। মান বড় মিষ্ট যেখানে যথার্থ প্রণয় থাকে। সেই ভালবাসা গোবিন্দদাসের চিত্রে বড় মধুর রূপ ধারণ করিয়াছে।

সখী চরিত্র বৈষ্ণব কবিতায় বড় উপাদেয়। নিঃস্বার্থতার মূর্তি স্বরূপিনী সখীগণ বৈষ্ণব কাব্যের অলঙ্কার স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধনাই ইহাদের চরম সাধনা, ইহাতেই তাহাদের সুখ, ইহাতেই তাহাদের তৃপ্তি। মানে সখীদের চিত্র অত্যন্ত মনোহর। শ্রীরাধার হৃদয়ের সকল তত্ত্ব সখীদের কাছে বিদিত, যখন শ্রীরাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনই সখী বুঝিল যে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সখীর কার্য আরম্ভ হইল। যখন রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিলেন, তখন সখী তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু যখন আবার রাধার অন্তঃকরণ ব্যথা বিগলিত বলিয়া জানিতে পারিল, তখন যুগল মিলন সাধিত করিবার জন্য সখীর চেষ্টার অবশেষ রহিল না। সকলের অপেক্ষা ফুটিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। স্বার্থহীন প্রেম গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ চরিত্রে সম্যক বিকশিত।

গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যে সুন্দর নিঃস্বার্থতার আরোপ করিয়াছেন তাহা আমরা বিদ্যাপতির অথবা চণ্ডীদাসের মানের চিত্রেও দেখিতে পাই না, ইহা তাঁহার কম ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। ইহাই তাঁহার কবিত্বের প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। কবি এই স্থলে তাঁহার মনুষ্য চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের প্রেম—সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবির প্রেম—যে কি অলৌকিক পদার্থ তাহা যাঁহারা তাঁহার "প্রেমবৈচিত্ত্য" মনঃসংযোগ সহকারে চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈষ্ণব কবির "সম্ভোগ" ইন্দ্রিয় চপলতা ও জঘন্য লালসার বিলাসক্ষেত্র মাত্র নহে। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার অমর ভাষায় এই প্রেমবৈচিত্ত্যের সূত্রপাত করিয়াছেন—"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" গোবিন্দদাসে প্রেমবৈচিত্ত্য আরও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তাঁহার চিত্রে "বিচ্ছেদ ভাবিয়া" নাই; পূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যেই পূর্ণ বিরহ।

গোবিন্দদাস আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে প্রেম অপার্থিব সামগ্রী, ইহা অঙ্গের সঙ্গ দ্বারা ধরা যায় না; রাধাকৃষ্ণের যে অপার্থিব ভালবাসা তাহাতে অঙ্গসঙ্গের উপলব্ধি পর্যন্ত নাই। বৈষ্ণব কবির ভালবাসার আধ্যাত্মিকতা এইখানে উজ্জ্বল বর্ণে নির্দেশিত হইয়াছে। প্রেমের অস্তিত্ব অঙ্গসঙ্গে নহে, প্রেমের স্থান হৃদয়ে। তাই কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, যে অসীম লালসায় বিচলিত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মিলন কামনা করিয়াছিলেন সেই লালসার সম্পূর্ণ পরিণতি ফলপ্রাপ্তির কালেই এই প্রেমিকযুগল বুঝিতে পারিলেন যে, সম্পূর্ণ দৈহিক মিলনেই পূর্ণ বিরহাবস্থা উপস্থিত হয়। বিদ্যাপতি প্রেমের লালসা, চণ্ডীদাস প্রেমের উন্মাদ ও গোবিন্দদাস প্রেমের আধ্যাত্মিকতা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত আধুনিক ক্ষমতাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের এই চিত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিয়াছেন "হৃদয়ের ধন কিরে ধরা যায় দেহে।" প্রেমবৈচিত্ত্যে প্রেমের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা চিত্রিত হইয়াছে।

প্রেমের সাধনায় লালসা বড় উপকারী। তীব্র লালসা মনে না আসিলে আকাঙ্ক্ষিতের জন্য লালায়িত হইতে পারা যায় না। যদি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছ ত হৃদয়ে প্রিয়সঙ্গের জন্য অসীম লালসা

পোষণ কর, তোমার প্রতি অঙ্গকে বাঞ্ছিতের প্রতি অঙ্গের আশ্লেষ-সুখ-সম্ভোগের অমৃত রসাস্বাদনে প্রেরিত কর; তবে ইষ্টলাভ কামনা হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে। রূপ—রূপ নয়, যে অবধি সে রূপ প্রিয়তমের সুখ উৎপাদন না করে, অঙ্গ—অঙ্গ নয়, যে অবধি তাহার দ্বারা প্রিয়তমের সেবা না হয়, দেহ—দেহ নয়, যে অবধি তাহা প্রিয়তমের ভোগার্থ উৎসর্গীকৃত না হয়। মনকে সর্বদা প্রিয়চিন্তায় নিযুক্ত রাখ। কিন্তু মনে আকাঙ্ক্ষার বা লালসার বিন্দুমাত্র লোপ করিও না। মনের সমস্তটাই প্রিয়তমের সঙ্গকামনারূপ অতল জলে ডুবাইয়া দাও। গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রথমস্তর এইভাবে বিরচিত। গোবিন্দদাসের প্রথমস্তর কেবল সৌন্দর্য ও লালসা, রূপ ও আকাঙ্ক্ষা। এখানে দেখিবে রূপের জয়, রূপতৃষ্ণা, আসঙ্গলিপ্সা, মিলন চাঞ্চল্য, হৃদয়ের তরলতা মান-অভিমান, সকলই কিন্তু একটি সুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত অনন্ত ভালবাসা। তিনি বলিতেছেন তুমি মনে মনে ভালবাস, তাহাতে তোমার প্রিয়তমের কি আসে যায়, তোমার যাহা কিছু দেহ, মন, ইন্দ্রিয়-সব তাঁহাকে অর্পণ কর, তাঁহার রূপ সম্ভোগতৃষ্ণা মিটাও; তোমার অঙ্গসঙ্গ কামনা চরিতার্থ কর, প্রিয়তমকে বুকে রাখ, মনকে সাক্ষীস্বরূপ এ সকল কাজেই নিযুক্ত কর, কিন্তু তাহার বেশী এখন আর তাহার কর্তব্য নাই, তাহার বেশী তাহাকে আর কিছু করিতে দিও না। লালসার দ্বারা প্রিয়তমকে লাভ কর। স্বভাবজ্ঞ কবি এই স্তরে মনুষ্যস্বভাবের নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রেম সাধনার দ্বিতীয় তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রেমবৈচিত্ত্য এই স্তরের অন্তর্গত। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লালসা দ্বারা প্রিয়তমের কাছে উপনীত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করার ইচ্ছা করা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই, সেই অমৃতস্বরূপের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাভূত, ইন্দ্রিয়ের কার্য একেবারে বিলুপ্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুভূতি হইয়াও হয় না। এখানে আর গোবিন্দদাস প্রণয়ের

কথা কহিতেছেন না, এখানে তিনি প্রেমের কথা, ভক্তির কথা কহিতেছেন। এখানে তাঁহার নায়ক-নায়িকা নরনারী নহে, ভক্ত ও ভগবান। কিন্তু তাঁহার যে অমৃতময় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন ব্যপদেশে বিবৃত হইয়াছে, তাহা যদি পার্থিব প্রণয়ের আদর্শ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের অশেষ উপকার।

গোবিন্দদাসের তৃতীয় স্তর আরও উপাদেয়। এই স্তরে শ্রীরাধার বিরহ, দিব্যোন্মাদ, ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দদাস দেহবিস্মৃত হইয়াছেন, যেটুকু ইন্দ্রিয়-স্মৃতি আছে, তাহাও আর স্বার্থময়ী নহে, যেটুকু ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জাগরুক আছে মন; আর জাগিয়াছে মনের প্রবর্তক আত্মা। এখন রসাস্বাদ, সম্ভোগ বাসনার পরিবর্তে আছে একীকরণ বাসনা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের সহিত মিশাইয়া দিবার বাসনা—হৃদয় দিয়া বাঁধিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, এখন শ্রীরাধার মনে দেহের কথা আসে না, আসে প্রাণের কথা, নিজের সুখের কথা আসে না, কেবল বঁধুর সুখের চিন্তা লইয়া, বঁধুর স্মৃতি লইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার কামনা লইয়া এখন তাঁহার দিন কাটিতেছে। গোবিন্দদাস এইখানে কবিত্বের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া অমর সঙ্গীত গাহিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের এই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার শিল্পকৌশল বিচিত্র, তাঁহার কবিত্ব সরস ও প্রগাঢ়। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিদ্যাপতি রসিক, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ভক্ত, তিনজনেই প্রেমিক, তিনজনেরই কবিত্ব বঙ্গসাহিত্যে এক অভাবনীয় ভাববন্যার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রেমরাজ্যে এক অভূতপূর্ব উল্লাসের অবতারণা করিয়াছে, বৈষ্ণব দার্শনিকের পথ সুগম করিয়াছে, বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ে মন্দারসুরভিত মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়াছে, প্রেমিকার প্রেমতৃষ্ণা

মিটাইয়াছে, ভবিষ্যৎ কবির ভাবপ্রসূন বিকশিত করিয়াছে, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই হৃদয়ে পবিত্র আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

সতীশচন্দ্র রায়। গোবিন্দদাস কবিরাজ।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮)

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শাকে (কাহারও মতে ১৪৪৭ শাকে) তেলিয়া-বুধুরী গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে, গোবিন্দের প্রায় অর্ধেক বয়স পর্যন্ত তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় নিজ ইষ্টদেবতা ভগবতীকে স্মরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে—

আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার।
গোবিন্দ-শরণ লও পাইবা নিস্তার॥

ইহার বহু পূর্বেই গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক শক্তি-উপাসনা ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া গোবিন্দও উক্ত শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত আচার্যকে নিজালয় বুধুরি গ্রামে লইয়া আসার জন্য অনুনয় করিয়া অগ্রজের নিকট পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে আচার্য প্রভু রামচন্দ্রের সহিত বুধরী গ্রামে গমন করিয়া গোবিন্দকে রাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে, আচার্য প্রভু গোবিন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ—

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥

(প-ক-ত, ২১৭০)

ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন এবং ইহাই গোবিন্দদাসের প্রথম পদ রচনা। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্যান্য সুললিত পদাবলীর সহিত তুলনা করিলে, এই পদটি তাঁহার প্রথম রচনা মনে করা বোধহয় অসঙ্গত নহে, কারণ জনম সংসঙ্গে বাক্যটিতে যে শ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটিয়াছে, গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সের কোন পদে সেইরূপ ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু ঐরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও এই পদটি গোবিন্দদাসের প্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহা যে তাঁহার ভাবীকালের অসামান্য কবিত্বের সূচনা করিয়াছিল, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কথিত আছে যে, আচার্য প্রভু কিছুদিন পরে গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন—গোবিন্দদাস সেই পদ এমন সুন্দরভাবে পূরণ করেন যে আচার্য প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া তথায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উক্ত গোস্বামী প্রভুদিগকে স্বরচিত সঙ্গীতমাধব নাটক ও পদাবলী শ্রবণ করাইলে, তাঁহারা গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুবাবু গোবিন্দদাসের কবিত্বের জন্যই 'কবিরাজ' উপাধি পাওয়ার আখ্যায়িকাটি প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস তাঁহার কবিত্বের জন্য 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অগ্রজ তাদৃশ কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন না হইয়াও "রামচন্দ্র কবিরাজ" নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বত্র কথিত হইয়াছেন দেখিয়া বৈদ্যকবি গোবিন্দদাসের কবিরাজ উপাধি বংশগত উপাধি বলিয়াই আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। গোবিন্দ

কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে পদকল্পতরুর উল্লিখিত—

কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" (প-ক-ত)

একই ব্যক্তি। কবিনৃপবংশজ বাক্যের অর্থ কবিরাজ বংশজাত। সুতরাং রামচন্দ্র ও গোবিন্দের 'কবিরাজ' উপাধিটি বংশগত ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। বৈদ্য বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ বৈদ্যক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে অন্য উপাধি সত্ত্বেও সাধারণ কবিরাজ উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন—অদ্যাপি বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র ইহা দেখা যায়; সুতরাং গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধিলাভের আখ্যায়িকাটি অমূলক এবং গোবিন্দদাস প্রসিদ্ধ বটে গোস্বামীদিগের ন্যায় বৈষ্ণব আচার্যগণের স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই—ইহাই আমাদিগের অনুমান হয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী অসাধারণ কবিত্ব ও মধুরতার জন্য পূর্বেই সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তারপর তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য হইয়া তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট অতি প্রিয়তম বস্তু হইয়া পড়িল; সুতরাং গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রকৃতিগুণে উভয় প্রভাব সমান কার্যকর হয় নাই। বিদ্যাপতি দুর্বোধ্য মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—ইহা দেখিয়া যদিও গোবিন্দদাসের ন্যায় বাঙ্গালী কবির উপরে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক থাকা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু কার্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চর্য সাদৃশ্য;—এমন কি তিনি যে

বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই—পক্ষান্তরে তাঁহার উপরে চণ্ডীদাসের অল্পমাত্র প্রভাব থাকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য করা কঠিন। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? আমাদিগের বিশ্বাস গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ জীবনচরিত্র হইতেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত সাহিত্যে নিতান্ত পারদর্শিতা ও প্রৌঢ় বয়সে পদ-রচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কারণ বটে। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপতির সংস্কৃত-মূলক মৈথিল ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগোবিন্দের মাত্রাবৃত্তের অনুকরণে যে সকল ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের ন্যায় গুরু লঘু বর্ণের প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীবতা ও ছন্দের ঝঙ্কার যেরূপ রক্ষিত হইয়াছে—তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ অনুপ্রাসাদি শ্রুতিমধুর শব্দালঙ্কার ও উপমারূপক প্রভৃতি মনোহর অর্থালঙ্কার যেরূপ লক্ষিত হয়, আর কোন ভাষাকাব্যেই সেইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন গোবিন্দ কবিরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ যে চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর আদর্শে পদ রচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সেইরূপ অলঙ্কারের ছটা না থাকিলেও, তিনি তাঁহার সরল ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকার যে সুমধুর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তিনি তাঁহাদিগের মুখ দিয়া প্রেমের যে গভীর উচ্ছ্বাসময়ী উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালা ভাষার নিকট তাহা অমূল্য; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সেই শৈশব অবস্থায় বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের অবিমিশ্র স্বাভাবিক বাঙ্গালা ভাষার মাহাত্ম্য বুঝার সাধ্য কাহারও ছিল না, কোন ভাষার আদিকবির প্রকৃত মাহাত্ম্যই সমকালীন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত

ভাষার রচনাই অধিক স্বাভাবিক ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রেমাবতার ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্য কোন ভাষায় তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাক্য না পাইয়া শিখরিণীচ্ছন্দে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রুজল প্লাবিত বদনে গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন—"জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" কিন্তু যেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব তাঁহার পরবর্তী সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই, সেইরূপ স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও পরবর্তী কবিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের এইরূপ বিশুদ্ধ পদাবলীর সংখ্যা খুব অল্প। পদকল্পতরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদের মধ্যে ঐরূপ পদের সংখ্যা ৮।১০টির অধিক হইবে না। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত পদের ভাষাই বিশুদ্ধ কিম্বা মিশ্র মৈথিলী। ইহাই পরবর্তী সময়ে, চলিত কথায় "ব্রজবুলি" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্ত বিষয়েই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার এইরূপ একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আমরা রাধামোহন ঠাকুর, বলরাম দাস প্রভৃতি অন্যান্য অনুকরণকারী কবিগণের কবিতায় খুঁজিয়া পাই না। এইখানেই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব; ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠ সফলতা।

প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষার অনুকৃতি হইলেও বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, বিদ্যাপতি তাঁহার স্বদেশের প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ঐ ভাষার প্রচলিত তদ্ভব ও 'দেশজ' শব্দের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার স্বাভাবিক

রীতি (idiom) তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, ইহাে একদিকে যেমন তাঁহার রচনা স্বাভাবিকতায় তাঁহার স্বদেশীয় সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিগণে নিকট দুর্বোধ্য হইয়াছে, সেইজন্যই বিদ্যাপতির পদাবলীর স্থানে স্থানে অর্থনির্ণয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপতির সমকালিক মৈথি ভাষার ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি জানা ব্যতীত, সেই ভাষার তদ্ভব দেশজ শব্দাবলি কিংবা রচনারীতিতে সেইরূপ পারদর্শিতা লাভ ক বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি মৈথিল ও দেশজ শব্দে পরিবর্তে যে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রচ পরিমাণে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। যাহা হউক, গোবিন্দদাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাঁহা পরবর্তী পদকর্তৃগণও পূর্বোক্ত কারণে এই প্রণালীতে পদরচনা করা তাঁহাদিগের প্রবর্তিত 'ব্রজবুলি' বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় দুর্বোধ্য নাই। সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষ কতকগুলি নিয়ম জানা থাকিলে, সহজেই এই ভাষা আয়ত্ত করা যাই পারে। মৈথিল ভাষার নিয়মানুযায়ী কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির ও অল্প পরিমাণ 'দেশজ' ও 'তদ্ভব' শব্দের সহিত প্রচুর পরিমাণ সংস্ শব্দের ব্যবহারে এই যে নূতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়—ইহ পরে ব্রজবুলি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা মৈথিল, হিন্দি, ব্রজভ প্রভৃতি উপভাষার ন্যায় কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই।

গোবিন্দদাসের পূর্বে অন্য কোন বাঙালী বৈষ্ণব কবি 'ব্রজবুলি'তে পদরচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাসু ঘোষ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তৃগণ সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গ ভাষায় অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ২/১টি পদে ক 'ব্রজবুলির' ব্যবহার দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হইে পদাবলী সাহিত্যে আমরা 'ব্রজবুলি'র প্রাধান্য দেখিতে পাই,—য

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কোন কোন স্থানে ব্রজবুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার 'সহজে সুনিক পুতলী গোরী, জারল বিরহ আনলে তোরি।' এবং 'দেখরি সখি শ্যামচন্দ, ইন্দুবদনী রাধিকা।' ইত্যাদি ব্রজবুলির রচনা ও ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু এরূপ পদের সংখ্যা নিতান্তই কম। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি পদের জন্য বিখ্যাত নহেন—তিনি গম্ভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুললিত সরল বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের আদর্শে যে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পদছাড়া যে পদের তুলনা সমস্ত পদাবলী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই পদাবলীর জন্যই জ্ঞানদাস বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য প্রভুর পূর্ববর্তী যুগে যেমন বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস—পরবর্তী যুগে সেইরূপ গোবিন্দদাস আর জ্ঞানদাস,—যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ সাম্য ও বৈষম্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যাহা হউক পূর্বোক্ত কারণে গোবিন্দদাস কবিরাজকেই পদাবলী সাহিত্যে ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের প্রবর্তিত ব্রজবুলির এই নূতনত্বই একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করায়, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার ন্যায় তাঁহার রচনা অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্যে অনেকস্থলে এরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে যে, জয়দেবের রচনা ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ লক্ষিত হয় না। গোবিন্দদাসের পদমাধুর্য ও অনুপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র; সহৃদয় পাঠক তাঁহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদেই ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতূহলী পাঠকবর্গকে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ষড়বিংশ পল্লবের ৫। ৮। ১২। ১৩। ১৫—২৬ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গোবিন্দদাসের—

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন
জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা।

তরুণারুণ-থল কমলদলারুণ
মঞ্জীর রঞ্জিত চরণা ॥ (প-ক-ত ১৬৮৯ পৃষ্ঠা)
মুকুলিত-মল্লী মধুর মধু মাধুরী
মালতী-মঞ্জুল মাল।
মন্দ মকরন্দ মুদিত মত্ত মধুকর
মণ্ডিত মৌলি মন্দার ॥ (ঐ, ১১৯৯ পৃষ্ঠা)

ইত্যাদির সুমধুর রূপবর্ণনাসমূহের তুলনাস্থল কেবল গীতগোবিন্দেই পাওয়া যায়—কিন্তু গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এরূপ কতকগুলি পদ আছে যাহাতে পদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস চলিয়াছে।

পরবর্তী কবি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, প্রভৃতি অনেকে গোবিন্দদাসের এই সংস্কৃত-বহুল রচনা-পদ্ধতি ও অনুপ্রাসচ্ছটার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার নিকটেও আসিতে পারেন নাই। সুতরাং পদমাধুর্য ও অনুপ্রাস প্রাচুর্যে পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কালিদাস রায় ॥ গোবিন্দদাস। (বঙ্গশ্রী, ১৩৪৯)

গোবিন্দদাস তিনজন। একজন গোবিন্দদাস ঝা, ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির অনুসরণে ইঁহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী। ইনিও পদকর্তাদের মধ্যে বিখ্যাত। ইঁহার রচিত পদগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়া বুধুরি (মুর্শিদাবাদ) গ্রামনিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম ও প্রতিপালন। গোবিন্দদাস বাঙ্গালায় ২।৪টি ও ব্রজবুলিতে বহু পদরচনা করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস বঙ্গের একজন মহাকবি।

ইহার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। ইনি নিজে বড় ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তু ইনি ভক্তির ভাবাকুলতা সম্বরণ করিতে পারিতেন। ফলে, ইহার পদে কবিত্বের অবাধ স্ফুরণ হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিত্ব প্রাণের গভীর আকুতির স্বতস্ফূর্ত বিকাশ নয়—সেজন্য বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবিত্বমহিমা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে তিনি আর্টের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। কবিতায় বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সাধনে কবির কোথাও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য তেমনি পদবিন্যাসের চাতুর্য, তেমনি ভাবপ্রকাশের কৌশল, তেমনি আলঙ্কারিকতা। কোথাও কোথাও অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের আতিশয্যে ও অর্থালঙ্কারের জটিলতায় তাঁহার পদগুলি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। স্থলে স্থলে Strained Metaphorও আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার পদে অর্থশ্লেষ, রূপক, কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, অতিশয়োক্তি, বিষম, সূক্ষ্ম, সন্দেহ, মীলিত, লুপ্তোৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমা যদি কালিদাসস্য হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসস্য বলিতে হয়।

গোবিন্দদাসের কবিতায় সর্বাপেক্ষা সংস্কৃত কবিদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সংস্কৃত শ্লোককে ব্রজবুলি পদে নব রূপ দান করিয়াছিলেন—বহু সংস্কৃত কবির ব্যবহৃত অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বহু সংস্কৃত কবিপ্রৌঢ়োক্তি তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাপতির কাছেও গোবিন্দদাস ঋণী, শুধু ভাষা ও ছন্দের জন্য নয়। বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিন্যাস চাতুর্যও তিনি অধিগত করিয়াছিলেন, অবশ্য বহুস্থলেই শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্য গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও ঋণী। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি, উল্লাস রসের কবি। রাসারম্ভের "শরদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ, ফুল্লমল্লিকা

মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণি" ইত্যাদি পদের মত উল্লাস রসের পদ পদাবলী—সাহিত্যেও নাই। "বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ" আর একটি উল্লাস রসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদ কর্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত "বাৎসায়নী স্বাধীনতা" কাহারও পদে দেখা যায় না, প্রকাশের ভাষার আলঙ্কারিকতা ও মণ্ডনকলার গুণে অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস্য, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা, মিলনাকুলতা ও স্বপ্ন-মাধুর্যের পদগুলি জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের পরম সম্পদ। কবির গোষ্ঠবিহারের পদও চমৎকার। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা গানে যে ছন্দ অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের ঐশ্বর্য কীর্তনীয়ার মৃদঙ্গে নানা বর্ণচ্ছটায় যেন পুষ্পিত হইয়া উঠে। চাতুর্যের দ্বারা যে কতটা মাধুর্যের সৃষ্টি করিতে পারা যায়—তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।

আলঙ্কারিকতার জন্য গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়। অলঙ্কৃত করিয়া না বলিলে কোন বক্তব্য কাব্য হইয়া উঠে না, তাহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি এত দুর্লভ অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া রাজরাজেশ্বরী রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই আলঙ্কারিকতা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের মত স্বাভাবিকভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই। মনে হয়, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলমণি, রসমঞ্জরী, অলঙ্কার কৌস্তুভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া অলঙ্কার প্রয়োগে পারদর্শী হন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্যই তিনি কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। অনলঙ্কৃত সরল ভাষায় বৃন্দাবনলীলার কোন কোন অঙ্গকে প্রকাশ করিলে তাহা অশ্লীল হইয়া উঠে। বৃন্দাবনলীলার অতি গুহ্যতম অংশকেও বাণীরূপ দিয়াছেন। কিন্তু আভরণের আবরণে সে সমস্ত অশ্লীল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর স্বর্ণ হীরকের অলঙ্কার নয়—ফুলের অলঙ্কার। তাই ইহার সৌরভ আছে। এই সৌরভ অলঙ্কারগুলির ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি। ভাবাকুলতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে গোবিন্দদাসের পদে যেরূপ পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা এরূপ কোন বৈষ্ণব কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না।

গোবিন্দদাসের অনেক পদে অলঙ্কার প্রয়োগেরও ক্রমশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। 'নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম সো আওল ব্রজমাঝ' এই পদটি তাহার দৃষ্টান্ত। গোবিন্দদাসের অধিকাংশ রচনার Sequence Emotional নয়, Intellectualও নয়, Rhetorical, অলঙ্কৃত কাব্যধারায় নিজস্ব একটা ক্রম আছে—গোবিন্দদাস সেই ক্রমই অনুসরণ করিয়াছেন আলঙ্কারিক ভঙ্গী যেভাবে কবিকে পরিচালিত করিয়াছে কবির লেখনী সেইভাবেই চলিয়াছে। অলঙ্কারের দিক হইতেই ইহাদের উৎকর্ষ সন্ধান করিতে হইবে।

রচনার উপাদান উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে গোবিন্দদাস যে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই তাহা নয়। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন—বাসকসজ্জার ও অভিসারের আয়োজন উপকরণ পূর্ববর্তী কবিদের রচনা হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি প্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব কিছুই দেখান নাই, মানভঞ্জন, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মামুলি রীতি আছে তাঁহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই যে, পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। অধিকাংশ পদেই তাঁহার নিজস্ব শক্তির একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুসারক বা অনুকারক নহেন—তিনি একজন স্রষ্টা, পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়িলে চির পুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।…

গোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুর্যের কবি। এই চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া তিনি অনেক সময় কৃচ্ছকল্পিত অলঙ্কারের জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক সময় ক্লিষ্টরূপকে (strained metaphor) পরিণত হইয়াছে।...

গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসের কথা আর কি বলিব? গোবিন্দদাসের রচনা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইয়েতেই ঋদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের প্রত্যেক শব্দের আদিতে একবর্ণ বসাইয়া কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক চরণের আদিতে একবর্ণ বসাইয়াও কতকগুলি পদ—এইগুলিকে অনুপ্রাস না বলিয়া অনুপ্রয়াসই বলিব। এগুলি জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয়।

গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, অনেক স্থলে দুই একটি জোরালো অনুপ্রাসের প্রয়োগে রচনা ললিত মধুর। আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত সুবিবেচিত অনুপ্রাস প্রয়োগ অনেকস্থলে রচনার আবৃত্তিকে সঙ্গীত করিয়া তুলিয়াছে। গোবিন্দদাসের বারমাসিয়া পদটি হিল্লোলিত অনুপ্রাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদে দীর্ঘস্বরগুলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে। অনেক সময় কবি যমক-মূলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে লালিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পর্বে পর্বে মিলগুলি অনবদ্য। গোবিন্দদাসের মিল শুধু অনবদ্য নয় কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য স্বভাবতই ব্রজবুলি পদে ছন্দো-হিল্লোলের সৃষ্টি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং অধিকতর নর্তনপর করিবার জন্য কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন। এসকল পদের অন্য ঐশ্বর্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য উপাদেয়।

গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক তাঁহারা স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের লীলা, তাঁহার ভাববিহ্বলতা, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রেমভক্তির গভীরতা, সরলতা, ভাবাকুলতা, মাধুর্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কবিতার পদবীতে উঠে নাই। রসসাহিত্যের দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরই কোন মূল্য নাই। সেগুলির তুলনায় শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগের লোচনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী সাহিত্যের দিক হইতে উৎকৃষ্টতর। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদগুলি রূপে রসে ছন্দে ঝঙ্কারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

গোবিন্দদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব-মূর্তিকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী কবিদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপের চেয়ে ঢের বেশী উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অপূর্ব রূপ-সৃষ্টি কেবল কল্পনার সরলতার জন্যই সম্ভব হয় নাই, তাহার সহিত অগাধ ভক্তিরও যোগ আছে। তাহাতেই যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহার মত অপূর্ব নির্মল অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি আর কাহারও ছিল না। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা পদাবলী শিবজটা হইতে বিমুক্ত সুরধুনী ধারার ন্যায় শুচিস্বচ্ছ নির্মল ও কলতরঙ্গময়। মহাপ্রভুর প্রেমের ঐশ্বর্য কবি একদিকে যেমন অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন—নিজের বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও আকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিতায় প্রকৃতির সহিত মুখ্য ভাবে না হউক, গৌণভাবে মানবহৃদয়ের সংযোগ দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছে, বিরহে সহধর্মিতা করিয়াছে। অভিসারের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়াইয়াছে। অভিসার পক্ষে সহায়তাও করিয়াছে।

প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় যে নব নব উপমান যোগাইয়াছে—তাহা সকল বৈষ্ণব কবির সম্পর্কেই খাটে। মাসে মাসে প্রকৃতির প্রভাবে বেদনার বর্ণ পরিবর্তিত হয়, কবি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার বারমাস্যার কবিতাটি প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের গভীর সংযোগের নিদর্শন।

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথা বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত শ্রেষ্ঠ কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারতবর্ষেও দুর্লভ!

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ গোবিন্দদাস (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১৩৬২)

গোবিন্দদাস নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি—আধুনিক কাল ধরিলেও। কাব্যশিল্পের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য না হউক—যাহা নিতান্তই দুর্লভ—এক বিশেষ দিক হইতে তাঁহার উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের প্রান্তসীমা স্পর্শ করিয়াছে, তাহা হইল, রূপশিল্প। গোবিন্দদাসের মত সচেতন শিল্পী বিরল। এ বিষয়ে পূর্বযুগের বিদ্যাপতি এবং পরযুগের ভারতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ মাত্র তাঁহার তুলনাস্থল। মধুসূদনের কাব্যেও চূড়ান্ত রূপকর্ম আছে, কিন্তু আর্টিষ্ট স্বয়ং তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে অর্ধচেতন। গোবিন্দদাসের কাব্যের রূপসম্পূর্ণতা কেবল কাব্যে সীমাবদ্ধ নয়, কবির মানসপ্রকৃতিতেও একপ্রকার সজ্ঞান সীমাবোধ আছে, যাহাকে কেবল উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক সংযম বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না; বস্তুতঃ উহা গোবিন্দদাসের কবিধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্য। এই সংযম বুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তুটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহাকে কাব্যের স্থপতিবিদ্যা বলা চলে। তাঁহার অধিকাংশ পদ যেন কুঁদিয়া তৈয়ারী—'কুন্দে যেন নিরমাণ'। প্রতিভার আলোড়নক্ষণে অর্ধবাহ্যদশায় আত্মসংবিতের বিলয়-মুহূর্তে প্রেরণার হাত ধরিয়া কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিভাবনা কাব্যের সবকয়টি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করিয়া অপরিসীম রসবোধ ও তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টির সহায়ে একটির পর একটি পদ রচনা

করিয়া গিয়াছে। ফলে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের উত্তাপের অভাব হইয়াছে, কিন্তু কাব্যের রূপ সম্পূর্ণতা যাহাকে বলে, তাহার অভাব কোথাও ঘটে নাই।

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি। সৌন্দর্যসাধনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে ঠিক সেই বস্তুটির সজ্ঞান অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার রাধিকা তাঁহার মানসলোকের তিল তিল সৌন্দর্যের সমাহারে গঠিত। কবি যত কিছু সৌন্দর্য পারিয়াছেন সঞ্চয় করিয়া, সুবিন্যস্ত করিয়া, রাধারূপের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমরা একথা বলিব, বহুলাংশে সফলকাম হইয়াছেন। এই রাধা ঠিক লৌকিক জীবনের কোনো মানবী নয়। চণ্ডীদাস, এমনকি বিদ্যাপতির মধ্যে মানবিকতার অবসর আছে, কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা একেবারেই অলৌকিক, অথচ অপূর্ব সুন্দর। তাহার মধ্যে প্রাকৃত দেহকামনা যতটুকু সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা কাব্যে নিবেশিত হইবার পূর্বতন লৌকিক উত্তাপ সামান্যটুকুও বজায় রাখে নাই। তাঁহার দেহকামনা বিদেহ ভাববাসনায় রূপান্তরিত। অবশ্য একথা সর্বত্র সত্য নয়; অভিসারের পদে ইহার বিপরীত দেখিতে পাইব। তাহার কারণ অভিসারে চলিষ্ণুতা প্রবল। পথে চলিলে পথের সৌরভ ও গৌরব অঙ্গে লাগিবেই।...

গোবিন্দদাস খাঁটি লিরিক কবি নহেন, কাব্যের মধ্যেও তাঁহার অবতরণ ঘটে নাই। তিনি অন্যের বেদনাকে—তাহার লীলা ও রসকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা শেষ পর্যন্ত অপরের রহিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে রাধার সহিত একাত্ম হইবার প্রচেষ্টা বহুস্থলে; তাই অন্যের বেদনা বা আনন্দ বাহ্যতঃ তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্য হইলেও যথার্থতঃ কবির প্রাণবেগ তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে তাহা মন্ময় গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। গোবিন্দদাসের কাব্যে ইহা ঘটে নাই। ঘটিয়াছে কি, না দুটি বস্তু—নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা। কবি স্বয়ং কাব্যের বিভাব নন বলিয়া

তাঁহার কাব্য উৎকৃষ্ট চিত্ররসের—আধার হইতে পারিয়াছে এবং সেই নিশ্চল চিত্ররাজি বিশেষ কাব্যপর্যায়ে চলৎশক্তি লাভ করিয়া নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যে যে পদ পর্যায়ে, তাহার কোনোটিতে হয় চিত্রধর্ম, নয় নাটকীয়তা—ইহার যে কোনো একটি অনুস্যূত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন। গৌর-চন্দ্রিকায় উভয়ের মিলন, রূপানুরাগে চিত্ররসের প্রাধান্য, অভিসারে নাটকীয়তা, মহারাসেও তাই।...

তদুপরি ছিল গোবিন্দদাসের সঙ্গীত-গুণ। গোবিন্দদাস খাঁটি অর্থে লিরিক কবি নন, অথচ সঙ্গীতের অবিচ্ছিন্ন স্রোতে একেবারে ডুবাইয়া দিতে তাঁহার মত সে-যুগে কেহই পারেন নাই, এ যুগেও এক রবীন্দ্রনাথই পারিয়াছেন। এই সঙ্গীত—অঙ্গ অথবা সুরাঙ্গ-সৃষ্টির প্রেরণা কবি পাইয়াছেন আর এক বাঙালী কবির নিকট—তিনি কান্ত-পদাবলীর শ্রীজয়দেব। ঠিক এই সূক্ষ্ম সঙ্গীতবোধ—কাব্যের সুর-চেতনা—ভারতবর্ষে বঙ্গেতর অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যে মিলিবে কিনা সন্দেহ। ভারতীয় সাহিত্যে সুর-সমর্পণ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সমর্পণ বলিতে দ্বিধা নাই। রবীন্দ্রনাথ একদা কালিদাসের কাব্যের ভাবগম্ভীর অথচ আপাত-অমসৃণ কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব জয়দেবের অতি ললিত অতি-মধুর পদাবলীর সহিত তুলনা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। সেই অতি যথার্থ সমালোচনার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য, ঐ অখণ্ড সঙ্গীত হিল্লোল একমাত্র জয়দেবের, অন্য কাহারও নয়। অনেকের ধারণা, বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাস এই সঙ্গীত-প্রাণতার জন্য ঋণী। বস্তুতঃ তাহা সত্য নয়। বিদ্যাপতির নিকট গোবিন্দদাসের ঋণ ছন্দের জন্য, সুরের জন্য সম্পূর্ণ নয়। বিদ্যাপতির অনেক পদ বাহ্যরূপে অপেক্ষাকৃত ছন্দ-পরুষ, অথচ তাহাদের ভাবগৌরবের তুলনা নাই! সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে। তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত প্রতিভা—অর্থাৎ সুর-প্রতিভার প্রশ্নে বিদ্যাপতির স্থান নিম্নেই।

পরিশিষ্ট

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥ পদরত্নাবলীর ভূমিকা। (বৈশাখ, ১২৯২)

বৈষ্ণবের ধর্ম ভালবাসার ধর্ম। সংসারে এমন সুন্দর আর কি হইতে পারে ? সেই ভালবাসার মোহে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহাদের গীতে সৌন্দর্যের আদর্শ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম অন্যভাবে বুঝা যাইত না, বুঝানত দূরের কথা। ভাষার শৈশবে গদ্যের অভাবে পদ্যে সকল বিষয়ই লিখিত হয়, ইহা অস্বীকার করি না, এবং বৈষ্ণব ধর্মের দর্শনভাগও সেইরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাজন পদাবলী সে নিয়মের ফল নহে। তাঁহারা যেভাবে তাঁহাদের ধর্ম বুঝাইয়া গিয়াছেন, তদেতর ভাবে ভালবাসার ধর্ম বুঝান অসম্ভব। পৌত্তলিকতায় পাপ থাকুক বা না থাকুক, বৈষ্ণবদের পৌত্তলিকতা অবশ্যম্ভাবী। মনস্বী কোমৎ ভিন্নভাবে এই ভালবাসার ধর্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কঠোর দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজের ধর্ম গাঁথিয়া তুলিয়াও তাঁহাকে ঘোর পৌত্তলিক হইতে হইয়াছে। নহিলে মনুষ্যত্বের আরাধনায়, ব্যক্তিবিশেষের রূপগুণধ্যান করার ব্যবস্থা তাঁহার নববিধানে স্থান পাইত না। ভালবাসার ধর্ম জীবন্ত ধর্ম। বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের যে জীবন্ত চিত্র আছে, এ সংসারে তাহা বড় সুলভ নহে। ইহার চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হইতে পারে ?

অতএব বৈষ্ণবধর্মে বৈষ্ণব কবির স্থান বড় উচ্চ। আজিকালি অনেকে বৈষ্ণবধর্ম বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি যে তাঁহারা মহাজনদের দাওয়াটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের বোধ হয়, ইহা বৈষ্ণবধর্মের কেবল একদেশ দেখার ফলমাত্র।

ভালবাসার পূর্ণ ধর্ম তাঁহারা অপূর্ণে পরিণত করিতেছেন—কেবল রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাহাই অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু সাত পাঁচের চেয়ে বড় বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, যে পাঁচ নহিলে তাহার চলিতে পারে। চৈতন্যদেব জন্মিবার বহুপূর্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেননা, সে ধর্ম তখন কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন,—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যে মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্তী, জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনের গ্রন্থ আলোচনা করিতেন তন্মধ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

এমত বলিতেছিনা যে, চৈতন্যের পূর্বেকার বৈষ্ণবধর্ম কেবল মধুর রস-সর্বস্ব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদির তখন নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। অন্য রসের যে প্রয়োজন তাহাও তখন অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন এবং তাহাই তাঁহারা গীত করিয়াছেন। বাস্তবিক অন্যরসের তাঁহারা বড় আলোচনা করেন নাই। যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বাৎসল্যভাব, ব্রজরাখালের সেই ঢলঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে, ব্রজের বনে বনে মধুর যে গোচারণ, সে মোহ যার বলে,—

দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে

স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার নীচের এই সব পরদা, তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন। অথচ ছাড়ার যোগ্য বলিয়া যে সব ত্যক্ত হইয়াছে, অথবা সৌন্দর্যের কটোগ্রাফ

সে সব ছবি প্রতিফলিত করার কুশলতা তাহাদের ছিল না, একথা বলিতে কেহ বোধ হয় সাহস করিবেন না। তাহাই বলিতেছিলাম যে গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্ম তেমন পরিপক্ক নহে।

এই অপরিপক্কতার ফলে চৈতন্যের পূর্ববর্তী ধর্ম কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতার ধর্ম, অন্ততঃ যে বন্ধন ধর্মের প্রাণ, তাহার সহায় নহে। এ সংসারে যাহার স্নেহের বন্ধন পর্‌দায় পর্‌দায় উঠে না—শৈশবে যে জনক জননীর বাৎসল্য, কৈশোরে সেই ভাই ভগ্নী সখার স্নেহ যে জানে না, সে যেমন জীবনের পরম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেই হইবে, নিরবচ্ছিন্ন মধুর রসের উপাসনা তেমনি তখন ভক্তজীবনকে কলঙ্কিত করিত। ভক্তের আদর্শ—আরাধ্য দেবতা স্বয়ং। আমি যাহা সুন্দর, যাহা উন্নত, যাহা পবিত্র জ্ঞান করিয়া জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আমার আরাধ্য দেবের আদর্শে তাহা মিলে না, এ বৈষম্যের ফল ধর্ম নহে অধর্ম। এ সংসারে যদি কেহ সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন ত তিনি ভক্তপ্রধান শ্রীচৈতন্য। জীবনের প্রত্যেক কাজে ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন নীলাচলে মধুর রসে বড় ভোর, প্রেমবিকারে সদাই আচ্ছন্ন, তখন তিনি প্রিয়তম শিষ্য ছোট হরিদাসকে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিলেন, কেননা সে সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রীজাতির—হইলই বা বৃদ্ধা—স্ত্রী-জাতির কাছে ভিক্ষা করিয়াছিল। আবার রামানন্দ রায় শিষ্যাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন শুনিয়া, তিনি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বলিয়া উঠিলেন,—"তিনিই প্রকৃত নির্বিকার সাধু, আমরা ভণ্ড মাত্র।" একথা যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহাদিগকে বুঝান সহজ হইবে যে, এই কঠোর নীতিজ্ঞ এবং ভাবুক প্রধান বাৎসল্য ও সখ্যভাবে মাতিতে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার মধুর রসোন্মাদ কেবল আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইয়াছিল।

এই আধ্যাত্মিক ভাব বড় উচ্চ জিনিস, অকপট প্রেম এবং স্বার্থমন্ত্র শূন্যতা ইহার ভিত্তিভূমি।—

'পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে।'

এ আধ্যাত্মিকতা বড় সহজ কথা নহে। চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাতে সেই আধ্যাত্মিকভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। চৈতন্যের মৌখিক শিক্ষা অতি সামান্য—তাঁহার কৃষ্ণময় জীবন পঞ্চরসের আধার করিয়া তিনি অলৌকিকত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। অবতারবাদের সাধারণ ইতিহাস এই যে, জীবদ্দশায় কোনও অবতারের প্রতিষ্ঠা হয় না—কালের ক্ষত যখন পূরিয়া উঠে, তখনি দূর ভবিষ্যবংশীয়েরা অসাধারণ প্রতিভায় দেবত্বের আরোপ করে। কিন্তু গৌরাঙ্গের বেলায় সে কথা বেশী খাটে না। জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণঅবতার এবং অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহারা সর্বদা তাঁহার সহবাস করিতেন, তাঁহারাই সে কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিষ্যেরা তাঁহার প্রতিমূর্তি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিলেন সে পূজা আজিও চলিতেছে। এ রহস্যের মূল—বলিয়াছি ত সেই আধ্যাত্মিকতা।

সেই আধ্যাত্মিকতার ফল,—চৈতন্যের পরবর্তী মহাজন পদাবলী। পদকল্পতরু এবং তাদৃশ অন্যান্য পদাবলীর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গের আধ্যাত্মিক লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অবতারত্ব স্থাপন করাই পরবর্তী মহাজনদের উদ্দেশ্য। যে কোন লীলার বর্ণনায় "আরে আরে মোর গৌর রায়" বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাঁহারা চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কবিতায় শেষ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের মহোৎসবে ছত্রিশ জাতির মিলনের ন্যায়, পুরাতন, নূতন সকল কবির কবিতা একস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে। অধিকাংশ কবি তাঁহার শিষ্য ও বন্ধু। চৈতন্যের পবিত্র জীবন প্রকৃত ধর্মের জীবন,—তাঁহার অসম্ভব স্বার্থশূন্যতা, সর্বোপরি তাঁহার উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভাব যে দেখিয়া মজিয়াছে, সেই কবি হইয়াছে। সুন্দরে সুন্দর নহিলে মিলে না—আর কবিতায় নহিলে বৈষ্ণবের ধর্ম বুঝা যায় না। তাই প্রথমে বলিয়াছি—বৈষ্ণব ধর্মে বৈষ্ণব কবির স্থান বড় উচ্চ।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ বৈষ্ণব কবিতার কথা। (নারায়ণ, ফাল্গুন ১৩২২)

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব। সাধারণ লোকে এমন কি বৈষ্ণব সাধকেরা পর্যন্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জানি। কিন্তু এই দেবতাও যে মানুষ, একথা পাঠকেরা বিস্মৃত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম কবিগণ কখনও ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যিনি যখন যেখানে এটি ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সেইখানে তাঁহার কবিতায় গুরুতর রসভঙ্গ হইয়াছে।

এইজন্য মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে দেবতা একথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবনলীলা যে নরলীলা, বৃন্দাবনের সকলেই যে মানুষ—তোমার আমার মত মানুষ, তোমার আমার মতন সুখ দুঃখের অধীন, তোমার আমার মতন মায়ামমতায় আবদ্ধ—ইহা যাহারা বুঝে না বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই নরলীলাকে যারা অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাদের পক্ষে মহাজন পদাবলীর নিগূঢ় রস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মাধুর্যের সাধক। আর বৈষ্ণব আচার্যগণ বারম্বার বলিয়াছেন যে ঐশ্বর্যজ্ঞানের উন্মেষমাত্র মাধুর্যরস একেবারে উবিয়া যায়। ঈশ্বর ভাবই ঐশ্বর্য। শ্রীকৃষ্ণকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে কৃষ্ণলীলার মাধুর্য কদাপি আস্বাদন করিতে পারিবে না। সে একটা কল্পনা করিয়া লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রস্নেহ কল্পনা করে, সেইরূপ সে একটা নিতান্ত মনগড়া আশ্রয়ে এই লীলারস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ কল্পনাবলে তার পুলকাশ্রু প্রভৃতির সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিকার শারীরিক, সাত্ত্বিক নহে। খোলে চাঁটি পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়া উঠে, এ এক নাচা; আর অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহাকে ছড়াইয়া দিয়া, তাহাদের চঞ্চল করিয়া নৃত্যশীল হওয়া অন্য

কথা। একটা সাধারণ স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র, আর একটা ভাবের তরঙ্গভঙ্গ। সেইরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল ঝঙ্কারে, কেবল সুরে, অথবা কেবল একটা অলীক মানস কল্পনা বলে পুলকাশ্রু প্রভৃতির উদ্রেক হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সত্য রসানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণ লোকে, এমনকি অনেক গতানুগতিক তিলককণ্ঠিধারী বৈষ্ণব পর্যন্ত এইভাবেই মহাজন পদাবলীর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন! আর এই সকল অলীক ভাবপ্রবণ লোকের হাতে পড়িয়া মাঝখানে অমূল্য পদাবলী সকল আপনার যথার্থ প্রাপ্য মর্যাদা হারাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ইহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহাই আমাদের বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষত্ব! অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবতত্ত্বের কথা বেশী কিছু জানি না; কিন্তু মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই। বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিতেই যেন কুণ্ঠিত হয়, এমন মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, কিন্তু অবতারী। যিনি অবতার করান তিনি অবতারী। সৃষ্টি ও স্রষ্টাতে যে পার্থক্য, অবতার ও অবতারীতে সেই পার্থক্য। আর অবতারী বলিয়া বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন— 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। আর তাঁরা ইহাও বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে নররূপের বর্ণনা ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়, তাহা মায়িক নয়, আকস্মিকও নয়, কিন্তু তাঁর নিত্যস্বরূপ। এই নিত্যস্বরূপে ভগবান দ্বিভুজ, "ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ"। তাঁহার চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি রূপই বস্তুতঃ মায়িক, ভক্তের তৃপ্তির জন্য তিনি এসকল অমানুষী ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করেন। দ্বিভুজ মুরলীধর রূপই তাঁর স্বরূপ। এই রূপই তাঁর নিত্যরূপ।

আর নররূপই যদি তাঁর নিত্যরূপ হয়, তবে মানবধর্মও তাঁর নিত্যধর্ম হইতেই হইবে। রূপে আর গুণে তাঁর মধ্যে ত কোন বিরোধ

বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না; তাহা হইলে তাঁর ভগবত্তত্ত্ব ও পূর্ণত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধরূপ, নরধর্ম এবং মানবপ্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়া তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ; এই মানুষরূপ ও মানুষীপ্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তাঁর মধ্যে এসকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে। আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি পরিণামী; তাঁর নররূপ ও নরপ্রকৃতি নিত্যসিদ্ধ। আর আমাদের এই অপূর্ণতাই তাঁর ঐ পূর্ণতার প্রমাণ প্রদান করে। আমরা যে এখানে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহা হইতে কোথাও যে আমাদের এই মানবতা নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে ইহা বুঝিতে পারি। আমাদের রূপ লালসা ঐ রূপকে নিয়ত খুঁজিয়া বেড়ায়। অন্তরে গুণের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে তাহাও ঐ অনন্ত গুণাধারকে অন্বেষণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয়, এই মন, এই বুদ্ধি, এই আত্মা, এই সর্বস্ব আমাদের সেই নরোত্তম ও পুরুষোত্তমের জন্য নিয়ত পিপাসিত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে। আর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সত্য রস আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে এই নরোত্তম পুরুষোত্তম রূপেই দেখিতে হইবে।

নর আর নরোত্তম, পুরুষ আর পুরুষোত্তম সজাতীয়, সমানধর্মী। এই নরের মধ্যেই ঐ নরোত্তম, এই পুরুষের ভিতরেই ঐ পুরুষোত্তম রহিয়াছেন। আবার ঐ নরোত্তমের মধ্যেই এই নর, ঐ পুরুষোত্তমের ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে। এইজন্য নর নরোত্তমকে চেনে বুঝে অত করিয়া ভালবাসে। যে যা নয়, সে তাহা জানে না, জানিতে পারে না; বুঝে না, বুঝিতে পারে না। আমরা মানুষ, যে ঈশ্বরে কোনো মানুষী ভাব ও মানুষী ধর্ম নাই, আমরা তাঁকে কখনও জানিতে ও ভজনা করিতে পারি না। ভাবের ঐক্য ব্যতীত ভজনা হয় না। ঈশ্বরের ভজনা করিতে হইলে হয় ঈশ্বরকে মানুষ হইয়া নামিয়া আসিতে হয়, না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া যাইতে হয়। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া তবে তাঁহার ভজনা সম্ভব করিয়াছে। আমাদের

দেশের বৈদান্তিক সাধনা অন্যদিকে মানুষকে ব্রহ্ম করিয়া উপরে তুলিয়া ব্রহ্মেতে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ করিলে তাঁর ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়, মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশ্বরের এই মানবত্ব সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মানুষ যদি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহা মানুষ নয়, আর মানুষ বলিতে যাহা ঈশ্বর নয়, যদি ইহা বুঝি, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না। আমাদের বৈদান্তিকেরা এইজন্য ঈশ্বরের মানবত্ব স্বীকারকে মায়িক বলিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান যিশুখৃষ্টের নরলীলাকে real নয়, apparent মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রচলিত অবতারবাদের এই স্ববিরোধিতা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন—ঈশ্বরই মানুষ, নিত্যসিদ্ধ মানুষ,—গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং—পরব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের (বা Ultimate Realityর) নিগূঢ় স্বরূপ মনুষ্য লিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই নররূপ তাঁহার নিত্যসিদ্ধরূপ। এইজন্য তিনি নিজস্বরূপে নরোত্তম বা পুরুষোত্তম।

কিন্তু আমাদের বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে কেবল নরোত্তম বা পুরুষোত্তম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপে আবার নিখিলরসামৃতমূর্তি, যাবতীয় রসের ও সমুদয় অমৃতের মূর্তি। রসবস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়, আন্তরিক অনুভবের দ্বারা কেবল ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বস্তুকে কেউ কোনোদিন চক্ষু দিয়া দেখে নাই; কান দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে নাই; রসনার দ্বারা কেহ কখনও এই বস্তুর স্বাদগ্রহণ করে নাই; নাসিকা দিয়া ইহার গন্ধও পায় নাই। এ বস্তু অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, তথা অরস। অথচ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভালবাসার রূপ নাই, অথচ রূপের আশ্রয়ে, রূপের প্রেরণা ব্যতিরেকে এ বস্তু জন্মে না, বা জাগে না, আর জন্মিয়া বা জাগিয়া রূপকে আশ্রয় না করিয়া ইহা আপনাকে প্রকাশও করিতে

পারে না। যে ভালবাসে তার মুখে, চক্ষে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমুদয় দেহের মধ্যে এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়া তোলে।

সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় মহাজন পদাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সখ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে বিস্তর প্রভেদ আছে। সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই রস অতি দুর্লভ বস্তু! রসবস্তুর দুইটি বিশেষ ধর্ম আছে—প্রথম এ বস্তু তরল, দ্বিতীয় এ বস্তু আনন্দময়। তরল বলিয়া এ বস্তু সর্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্ন, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। আর আনন্দময় বলিয়া এ বস্তু যাহাতেই সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সুখময় ও উৎফুল্ল করিয়া তুলে। সর্বসঞ্চারণ-শীলতা ও সর্বানন্দদান রসের মুখ্য ধর্ম। সখায় সখায় সম্বন্ধ সংসারে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল সখা সম্বন্ধেতে যে সখ্যরস ফোটে এমন বলিতে পারি না। সখ্য সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সখার জীবনটা সখাময় হইয়া যায়। সখার পঞ্চেন্দ্রিয় তখন সখাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সখার মন তখন অবিরাম সখারই ধ্যান করে। সখার সুখ দুঃখ তখন সখাকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। তখন তাহাদের দুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। তখন জাগ্রত ও সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও দূরে সকল স্থানে, ইহারা একে অন্যের মধ্যে বাস করে। এই রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, স্নায়ুমণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে এককথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষু সাক্ষাৎকার ব্যতীত পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতি সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গ লাভ করে। এই অবস্থা লাভ হইলে, সখ্যরস সখ্যরতিতে পরিণত হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি। আর এই পরিণত অবস্থা লাভ হইলেই সখ্যরসেতে, স্বেদকম্প পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিকার

প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন দেহে এবং আত্মাতে, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ে, শরীরী ও অশরীরীতে মেশামেশি ও মাখামাখি হইয়া যায়। আত্মা তখন দেহধর্ম ও দেহ তখন আত্মার ধর্ম লাভ করে। আত্মা তখন দেহেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়া পড়ে; আর দেহ তখন আত্মাতে উঠিয়া, আত্মাতে লুপ্ত হইয়া যায়। এ যে অপূর্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণনা হয় না। যে ভাগ্যবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের আস্বাদন পাইয়াছে সে ঠারে ঠোরে তাহা যে কি, ইহা একটু আধটু বুঝিতে পারে। অজ্ঞের নিকটে ইহা হেঁয়ালি মাত্র।

শৈশব যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া যে সখ্য আস্বাদন করিয়াছিলাম, তাহা কেবল একটা মানসবস্তু নয়। সখা ত কেবল আত্মা ছিলেন না। তাঁর শরীর ছিল, তাঁর রূপ ছিল। তাঁর শব্দ স্পর্শরূপরসে আমাদিগকে আকুল করিয়াছিল। তাঁরই জন্য ত ঐ রসের লোভে

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥

সে ত আমাদের কেউ ছিল না। সোদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর হইয়াছিল। কুটুম্ব ছিল না, কিন্তু সকল কুটুম্ব অপেক্ষা বড় হইয়াছিল। তার মাকে মা ডাকিলে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তার বোনকে বোন বলিতে জীবন মধুময় হইত। কোন সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে তাহাকে বাঁধিবার জন্য অস্থির হইতাম। সো নহে রমণ, হাম নহি রমণী—অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবার জন্য আকুল ও পাইয়া বিভোর হইয়া থাকিত। জাগিয়া তারই কথা ভাবিতাম; ঘুমাইয়া তারই স্বপ্ন দেখিতাম। সে যে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও বলিতে পারি না।

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈ দুঃখ্যান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

কোন কিছু না করিয়াও কেবল কাছে থাকিয়াই সে যে আমাদের সকল দুঃখের উপশম করিত, সে যে আমাদের কি বস্তু ছিল, তাহা কেমন

করিয়া বলিব ? যে এই অপূর্ব বস্তু কেবল একটা নিরাকার অশরীরী আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কহে। যে ইহাকে কেবল একটা রক্তমাংসের স্নায়বিক উত্তেজনা বলে সে আরও বেশী মিথ্যা কহে। এই রসকে যে সকল প্রকার শরীরধর্মশূন্য ও ইন্দ্রিয় সম্পর্ক বিবর্জিত বলে, সে ইহা যে কি তাহা জানে না, তার ভাগ্যে এ বস্তুর আস্বাদন লাভ হয় নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়া সত্যকথা ভাবিতে বা বলিতে সাহস হয় না। যে এই রসকে কেবল ইন্দ্রিয়বিকার বলিয়া জানিয়াছে, সেও ইহার প্রকৃত আস্বাদন পায় নাই। অতিপ্রিয় হইয়াও এই রস ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ও আচ্ছন্ন করিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াও ইহা নিয়তই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইয়া লীলা করে। একথা যে বুঝে, যে জানে, সে বলে, সেই রসবস্তু যে কি তার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

এই রস ইন্দ্রিয়-সহায়ে বস্তুর অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু রস আর অনুভব বা feeling বাস্তবিক এক বস্তু নহে। অনু অর্থ পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম—পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তু সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারকে ইংরেজিতে perception কহে। এই perception এর পশ্চাৎ পশ্চাৎ feeling এর উৎপত্তি হয়। এই feeling বা অনুভব অতি মামুলী বস্তু। সকল মানুষেরই এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীটপতঙ্গেরই যে হয় না এমন কথা বলা যায় না। এ বস্তু রস নহে। তবে রসবস্তু অনুভব বা feeling হইতে ভিন্ন হইলেও এই অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। রসমাত্রেই অনুভবের অধীন, অনুভবতন্ত্র। আর অনুভব মাত্রেই বস্তু সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, বস্তুর অধীন, বস্তুতন্ত্র। এইজন্য রসমাত্রেই বস্তুতন্ত্র। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত রস জন্মে না। তবে অনুভবে আর রসে প্রভেদ এই যে, অনুভব আপনার বিশিষ্ট আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় না, ছাড়িয়া বাঁচে না, রস যে

অনুভবের আশ্রয়ে জন্মে সর্বদাই সেই মুহূর্তে তাহাকে ছাড়াইয়া বর্তমান ও অতীত আরও বহুবিধ অনুভবকে জাগাইয়া তুলে। চক্ষু রূপই কেবল দেখে, শব্দও শোনে না, স্পর্শও পায় না, গন্ধও গ্রহণ করে না, আস্বাদনও করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু চক্ষু রূপ দেখিবামাত্র তাহার পশ্চাতে যে অনুভব জন্মে, তাহা যখনই রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হইয়া উঠে। কেবল অনুভব রূপ মাত্র দেখে। তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপই অপরূপ হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহ্য রূপ থাকে না, মনোগ্রাহ্য, ধ্যানগ্রাহ্য, সমাধিগম্য স্বপন স্বরূপ হইয়া উঠে।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূরে সঞে লোচন মন দুঁহু ধাব।
পরশন লাগি জনু অন্তর জীবন রহু কিয়ে যাব॥

রূপ তো সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার দুই চক্ষু আছে তারই ত হয়, কিন্তু রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে? যে পড়ে বুঝিতে হইবে তার রস জাগিয়াছে।...

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন এক এক ইন্দ্রিয় স্পর্শে সর্বেন্দ্রিয় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হয়।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

একে বলে রস। এ যে কেবল অনুভব বা feeling নহে, ইহাও কি আবার বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা feeling হইতে রসের বা romance এর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজেরই গাছ। অনুভব বা feeling এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য।

এই জন্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোন সত্য রস জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অনুগমন করিয়া রসবস্তু জন্মে, ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ এই রস জন্মিয়া কেবল নিজেই যে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায় তাহা নহে, ইন্দ্রিয়গ্রামকেও আপনার সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া তুলিয়া লয়, ইহাও সেইরূপ সত্য। রস-রাজ্যের একদিকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এবং অন্যদিকে আত্মবস্তু ও অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার; আর রসবস্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আনন্দের সেতু হইয়া আছে।

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা এই সত্যটা দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পীযূষ পদাবলীতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে, শরীর ও অশরীরীতে, দেহে ও আত্মাতে অদ্ভুত মেশামেশি দেখিতে পাই। তারই জন্য এ সকল অমৃত-পদাবলী পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়া বসে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী॥ বৈষ্ণব কবিতা। (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৪)

বৈষ্ণব কবিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর রসের কবিতা। বাঙালীর জীবনে এই দুটা রসই প্রধান—সেইজন্য দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব কবিতার বর্ণনীয় বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হয় বালগোপাল নয় কিশোর গোপীবল্লভরূপেই বন্দনীয় হইয়াছেন। হরপার্বতীর পিতৃমাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণ রাধার নয়—তাঁরা চিরকিশোর ও চিরকিশোরী, চিরন্তন-যুগল। নন্দ-যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে বাৎসল্যরস, শ্রীদাম সুদামাদি রাখালদের সঙ্গে সম্পর্কে সখ্যরস, এবং শ্রীরাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে সম্পর্কে মধুর রস ফুটিয়াছে। এই তিন রসই বাস্তবিক বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়। আমরা মানুষের প্রেমেও এই তিন রসেরই লীলা দেখি মায়ের ছেলের প্রতি প্রেম এক ধরনের প্রেম, সখায় সখায় প্রেম আর এক ধরণের প্রেম, এবং রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য-সার—যুগল প্রেম প্রেমের চরমরূপ।

অথচ বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরের আশপাশ অর্থাৎ ঐ গোচরণ, বাঁশী বাজানো, রাসমণ্ডলের নৃত্যগীতাদি, গোপীদিগের সহিত প্রেমাভিনয় প্রভৃতির সঙ্গে আর মধ্যযুগীয় ফরাসী ইতালীয় সাহিত্যের পাস্তোরাল কবিতার বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণবকাব্যের সেই pastoral দিকটাই মাইকেলের কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া ছিল এবং তারি ফলে তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা আসলে প্রেমের কবিতা, কাজেই তাকে idyll এর মত ব্যবহার করিলে তার ঠিক রসটি আদায় করা অসম্ভব।

তবু, রূপ ও বস্তুর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৈষ্ণব সাহিত্য অন্যান্য দেশের লোকসাহিত্যেরই সমপর্যায়ভুক্ত। মধ্যযুগীয় ট্রুবেদার বা কেল্টিক বা গেলিক ফোকলোর ও পুরাণকথা, পাস্তোরাল ও আইডিল্ জাতীয় রচনার সঙ্গে ইহার রূপগত ও বস্তুগত সাদৃশ্য কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে বলিয়া ইহা সময় সময় ইহার স্থূল পুরাণগত রূপ ও বস্তুকে বহুদূরে ছাড়াইয়া যায়—ইহা চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী হইয়া উঠে। পৃথিবীর বড় বড় প্রেমের কবির কাব্যের বাণীর সঙ্গে সেই সেই বাণীর সারূপ্য আছে।

প্রথমে সখ্যরসই দেখা যাক।

সখ্যরসের কবিতা বৈষ্ণব কবিতায় নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহা এত অল্প যে তাহা পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয় না। বলরামদাসের কতক কতক কবিতায় একটুখানি সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সুদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রীদাম তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের মুখ রৌদ্রে শুখাইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীদামের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সখ্য রসের কল্পনা বৈষ্ণব কবির নাই।

সখ্য রসের কবিতা পড়িতে হইলে পারস্য কবিতা বিশেষতঃ হাফেজের কবিতায় যাইতে হয়। আমি মূল পড়ি নাই, কিন্তু অনুবাদ পড়িয়াই

যে রস আস্বাদন করিয়াছি তাহা বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও পাই না। হাফেজের কবিতায় জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্বন্ধ দুই সখার সম্বন্ধ—পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়। জড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের সকল সৌন্দর্য সেই সখার মুখজ্যোতির ছটা।

"তাঁহার মদির আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে উন্মত্ত করে কখনও বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে আশ্বস্ত করে।"

"সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি (হাফেজ) সুখী, তখন তাঁর কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পদ সখার একটি কৃষ্ণ তিলের সমান মূল্যবান নয়।"

"ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি। জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখশোভাই তাহার সৌন্দর্যের উৎস।"

"তোমার দর্শন পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত আগত হইয়াছে; সে কি দেহে ফিরিয়া যাইবে, না বাহির হইয়া আসিবে—তোমার আদেশ কি?"

হাফেজের কবিতাতে যেমন তেমনি হুইটম্যানের কবিতাতেও সখ্যরস নিবিড় হইয়া জমিয়াছে। "Of the Terrible Doubt of Appearences" নামক একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন যে বিশ্বের সমস্তই মায়া ও ছায়া কি না এক এক সময় যখন সেই সন্দেহ হয়, মনে যখন নানা প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, তখন কবির বন্ধুরাই সেই সব প্রশ্নের অদ্ভুত রকমে উত্তর দেন।

'আমি যাঁকে ভালবাসি, তিনি আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেন বা আমার হাতখানি ধরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন,

যখন সূক্ষ্ম অনুভবগম্য বায়ু, বাক্যযুক্তির অতীত একটি বোধ আমাদিগকে নিবিড়ভাবে ঘিরে থাকে,

তখন আমি অব্যক্ত অনির্বচনীয় জ্ঞানের বিদ্যুতে বিদ্যুন্ময় হয়ে যাই,

আমি স্তব্ধ হই ; আমি আর কিছু চাই না।

'মায়ার' প্রশ্নের উত্তর বা মৃত্যুর পরপারে আত্মার অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না,

আমি নিশ্চিন্ত মনে কখনো চলি কখনো বসি—কারণ আমি তখন তুষ্ট।

যে বন্ধু আমার হাতটি ধরে আছেন তিনিই আমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছেন।

কৃষ্ণকে পাখার বাতাস করা বা রোদে তাঁর মুখ মলিন দেখিয়া কষ্ট পাওয়ার সখ্য রসের বর্ণনার চেয়ে হাফেজ বা হুইটম্যানের সখ্যরসের বর্ণনা যে অনেক বেশী নিবিড় ও বাস্তব এবং আধ্যাত্মিকও বটে, এটা বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

তারপর বাৎসল্য রস। এ রসে অবশ্য বাঙালীর জিৎ তাহা মানিতেই হইবে। খ্রীষ্টান দেশের আর্টে ম্যাডোনা ও বাল যিশুর ছবিতে Vicarious Motherhood এর সাধনায় বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোন দেশেই বাৎসল্যরসের এমন একান্ত প্রাচুর্য দেখিতে পাই না। সুতরাং বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার এই দিকটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমকে সখ্য প্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠস্থান দিলেও, সাহিত্য বা শিল্পে সখ্য বা কান্ত প্রেমের মত বাৎসল্য প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ হয় না। বাৎসল্য প্রেমের প্রকাশ সংকীর্ণতর। কেননা ইহার মধ্যে কোথাও কোন অস্পষ্টতা নাই; এ প্রেমে অভিব্যক্তির কোন ক্রমপরম্পরা নাই। ক্রমে ক্রমে জানিতেছি, ক্রমে ক্রমে পাইতেছি, এবং পাওয়ার মধ্যে না পাওয়ার বেদনা এবং না পাওয়ার মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ, ভোগে ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ উপলব্ধি করিতেছি—এসব রহস্য বিচিত্রতা যাহা সখ্য বা যুগল প্রেমে আছে যাহা বাৎসল্য-প্রেমে নাই। বালক কৃষ্ণের বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখানো প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যের অবতারণা বৈষ্ণব

কবিতায় শেষাশেষি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেবলি ননী ছানা চুরি এবং যশোদার তাকে প্রশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্রবেশে সাজানো ইত্যাদি ঘোরো বাল্যলীলার কথাই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মূল্যই থাক, কাব্য হিসেবে ইহার মূল্য অত্যন্ত কম।

বৈষ্ণব কবিতার সখ্য প্রেম যেমন, বাৎসল্য প্রেমও তেমনি—জীবনের বাইরের দিককার একটুখানি অংশকে তাহা ছোঁয়। Pastoral কাব্যের মত এ সকলের রস নিতান্তই বাইরের রস—ঐ একটু পাখার বাতাস করা, আহা উহু করা, বা ননীছানা খাওয়ানো বা শিখিপুচ্ছ দিয়ে চূড়াবাঁধা—ব্যস এই পর্যন্ত, তার বেশি নয়। সামান্য কবি Coventry Patmore এর Toys কবিতার মধ্যে বা George Macdonald এর 'The Baby' কবিতার মধ্যে বা William Blake এর Songs of Innocence এর মধ্যে অথবা R. L. Stevenson এর 'A Childs Garden of Verses' এর মধ্যে যে বাৎসল্যরস পাওয়া যায় তাহা সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী ঘাঁটিলেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। Tennyson এর De Profundis এর মত শিশুজন্মের রহস্যকথা বৈষ্ণব কবিতায় আছে কি ? রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার জো নাই—কারণ তিনি প্রতীচ্য কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্য দেশে যশস্বী হইয়াছেন, কেননা প্রতীচ্য দেশের লোকেরা তাহাদের কাব্যের নকলটা ধরিতে পারেনাই—নহিলে বলিতাম যে শিশুকাব্যে যে বাৎসল্য রস আছে—শুধু একটি কবিতা 'জন্মকথা'য় শিশুর আবির্ভাবের অনির্বচনীয় রহস্যের যে সংবাদ আছে—সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা কোথাও নাই।

আচ্ছা, এইবার মধুর-রসেই আসা যাক।

মধুর রসের বৈষ্ণব কবিতা আলোচনার আগে একটা কথা বলা দরকার যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্বেকার বৈষ্ণব কবিতা কেবলি মধুর

রস সর্বস্ব—সখ্য, বাৎসল্যাদি রসের কবিতা তখন নিতান্তই কম ছিল। সহজে সাধনায় ঐ মধুর রসেরই বাড়াবাড়ি, অন্য রসের আলোচনা বড় নাই।

দুগ্ধ শ্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

গোপালত্বের এসব সৌন্দর্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পরের সৃষ্টি।

আমি অবশ্য পূর্বরাগ, অনুরাগ, খণ্ডিতা, মান, বিরহ প্রভৃতি যে সকলভাগে বৈষ্ণব মধুর রসের পদাবলী সাজানো হইয়া থাকে, বৈষ্ণব সাধনা হিসাবে তার কি সার্থকতা আছে, তাহা আলোচনা করিতে চাই না। তবে এটা ঠিক যে, সেইসব ভাগের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গোপন প্রণয়ের একটা কাহিনী ক্রমশঃ বেশ জমিয়া ওঠে বটে। কিন্তু সেই কৃষ্ণকাহিনীর বিবৃতির জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা পড়িয়া যায়। অন্যান্য কবির জীবনের বিকাশ যেমন তাঁদের কাব্যাবলী আলোচনা করিলেই ধরা পড়ে, তেমনিতর বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদাবলী আলোচনা করিলে তাঁদের জীবনের বিকাশ কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনীটাকে আশ্রয় করিয়া তাঁদের আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, ঐ কতগুলি কৃত্রিম কোটরে তাঁদের পদগুলিকে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং তাঁদের ভাবের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করিবে কে? তৃতীয় কারণ লোকের মুখে মুখে পদকর্তাদের রচনায় ভাষার এমনি বদল হইয়াছে যে, সে ভাষার ভিতর হইতে রচনার কাল নির্ণয় একেবারেই দুঃসাধ্য। এইজন্য বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুকরা টুকরা ভাবে পাওয়া যায় মাত্র; ব্যক্তিত্বের পুরা চেহারা দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব কবিতা ব্যক্তিত্বের কবিতা হয় নাই।

তারপর রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের ঐ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন সম্বন্ধের কাহিনী, যে, তাহার বর্ণনায় কামশাস্ত্রের মালমসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানবপ্রেমের বিশেষ কোন মালমসলা জোগানো

যায় না। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁর নবপ্রকাশিত "Love in Hindu Literature' নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'The padavail are the songs of delight in flesh"—পদাবলী কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের আনন্দের গান। অন্ততঃ অধিকাংশ পদাবলী যে তাই এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই।

বিদ্যাপতি যে এই কামের মধ্যে মজিয়া আছেন—কিশোরীর দেহের রূপ ভিন্ন আর কিছুরি কথা তাঁর মনে লাগে না। তাঁর কাব্যে কেবলি—

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর যুবতীজন সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥

কেবলি—নিতি নিতি এইন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

কিন্তু বিদ্যাপতি এইরূপ একান্ত ইন্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তাঁর কবিতার মধ্যে খাঁটি সাহিত্যরস আছে। জয়দেব ছাড়া এমন পদলালিত্য, ছন্দের এমন ঝঙ্কার, আর কোন বৈষ্ণব কবিরই নাই। অবশ্য সে ঝঙ্কার ও শব্দলালিত্য কেবল কানেরই জিনিস,—কানকেই সুখ দেয়, প্রাণ পর্যন্ত পৌঁছায় না। কীট্‌সের সঙ্গে কোথাও কোথাও ইন্দ্রিয়ভোগের বর্ণনায় বিদ্যাপতির মিল আছে।

আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলি যে বিদ্যাপতির এইসব কবিতার মধ্যে কোনকালেই কোন রূপক ছিল না বা নাই,—এসব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয়বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন, 'Vidyapati is a professor of Kama Shastra'.

অবশ্য 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল' এই পংক্তি যে পদটিতে আছে বিদ্যাপতির সেই পদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া কীর্তিত। সেই পদটিতে আছে যে, জন্ম হইতেই রূপ দেখিলাম, অথচ

রূপের সীমা পাইলাম না ; লক্ষ লক্ষ যুগ প্রিয়জনকে হিয়ায় হিয়ায় রাখিলাম তবু হিয়া জুড়াইল না। বাস্তবিক প্রেমের এই যে অনন্ত ব্যাকুলতার কথা, ইহা বিদ্যাপতির আর কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। Keats এর Grecian Urn এর সঙ্গে এ কবিতার তুলনা চলে ; সেই কবিতায় কীট্সও ক্ষণিক সৌন্দর্যকে অমর করিয়া দেখিয়াছেন। ব্রাউনিং এর Two in the compagnaর সেই দুই ছত্র মনে পড়ে— Infinite passion and the pain of finite hearts that yearn." কীট্সও ইন্দ্রিয় সুখভোগের কবি, বিদ্যাপতিও তাই—কিন্তু কীট্স যেমন সেই সুখভোগের ভিতরেও হঠাৎ এক জায়গায় একসময়ে একটা detachment, একটা ভোগবিরতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁর Grecian Urn কাব্যে সমস্ত চঞ্চলভোগ, ও সৌন্দর্যের অনন্তত্ব অনুভব করিলেন, তেমন বিদ্যাপতিও ঐ পদটির রচনার কালে ক্ষণ-কালের মত ভোগবিরতির অবস্থায় পৌঁছিয়া রূপের ও ভোগের অনন্তত্ব অনুভব করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিদ্যাপতির সমস্ত কাব্যের মধ্যে এই একটিমাত্র কবিতা যদি দাঁড়ায়, তবে তাহাতে বৈষ্ণব কবিতা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না। বিদ্যাপতির বেলায় যেমন দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের বেলায় এবং অন্যান্য কবিদের বেলাতেও তেমনি দেখিব যে তাঁদের পদাবলীর দৈহিক প্রবৃত্তি-মূলক পদগুলি ছাড়িয়া দিলে খাঁটি প্রেমের কবিতা অতি অল্পই দাঁড়ায়। বিদ্যাপতির যদি দাঁড়ায় একটা, চণ্ডীদাসের গুটি দশ কি বড় জোর পনেরোটা কবিতা উৎরাইতে পারে।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতি বা অন্য কোন বৈষ্ণব কবিরই সঙ্গে তুলনা করা যায় না। চণ্ডীদাসের মধ্যে কামের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও প্রেমের কবিতাও যথেষ্ট আছে। তার কারণ চণ্ডীদাস সত্য সত্যই প্রেমের কবি ছিলেন। দান্তের বিয়াত্রিচের মত, শেলির মেরি গডউইন্ ও অন্যান্য প্রেমিকার মত চণ্ডীদাসের 'রামী' ছিল। এবং 'চণ্ডীদাস মনে

রঙ্গিনী প্রেম, কামগন্ধ তাহে নাহি।'—এটা তাঁর খুব জোরের উক্তিও বটে। তবু সেই চণ্ডীদাসের হাত দিয়া Vita Nuova বা Epipsychidion বা 'One word more' এর মত কোন অপূর্ব অধ্যাত্ম প্রেমের কবিতা কি বাহির হইয়াছে? অবশ্য প্রেমের খুব নিবিড় (intense) প্রকাশ মধ্যে মধ্যে চণ্ডীদাসে পাই বটে তারি দুটি একটি নমুনা নিয়ে উদ্ধার করিতেছি।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥ ইত্যাদি।

এর চেয়েও তিনি রামীকে—"তুমি বেদবাদিনী" ইত্যাদি উচ্ছ্বসিত ভাবে বন্দনা করিতেছেন, সেই বন্দনাটি এক আশ্চর্য পদ।

কবি রসেটি তাঁর 'House of life'এ বলিয়াছেন যে সকল বড় কবিতাই কবির জীবনের রূপান্তর মাত্র (Transfigured life of the poet)। চণ্ডীদাস পড়িলে এই মতের যাথার্থ্য বুঝা যায়। দান্তের জীবনের রূপান্তর যেমন ভিটা নুওভা, চণ্ডীদাসের জীবনের রূপান্তর তেমনি তাঁর অনেকগুলি পদ,—যে সকল পদে তিনি আর কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা বলেন নাই, তিনি তাঁর নিজের প্রেমের অপূর্ব উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু কোথায় দান্তে আর কোথায় চণ্ডীদাস! ভিটা নুওভাতে দান্তে বলিয়াছেন যে তাঁর চিন্তা 'pilgrim spirit' তীর্থযাত্রীর মত সমস্ত পাপবাসনা ও নীচতাকে পিছনে ফেলিয়া পুড়াইয়া দিয়া, যে অক্ষয় স্বর্গলোকে দেবীপ্রতিমার মত তাঁর সেই প্রাণপ্রতিমা নিত্য বিরাজিত,

সেখানে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইতে লাগিল—সমস্ত ভিটা মুওভা সেই ক্রমোত্থানের ইতিহাস। চণ্ডীদাসের কোনো রচনায় প্রেমের দ্বারা সেই পরিপূর্ণ আত্মশোধনের ইতিহাস পাই না। চণ্ডীদাসের কোনো রচনাতেই Epipsychidion এর 'Love's rare Universe' প্রেমের অপূর্ব জগৎ, অথবা 'One word more' এর 'novel silent silver lights and darks undreamed of' 'নীরব রজত শুভ্র স্বপ্নসম ছায়া আর আলো'র খবরও পাই না। তবে প্রেম সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মাঝে মাঝে অনেক চমৎকার বাক্য আছে, যথা :—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥"

কিম্বা— "পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥"

উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতায় শেষছত্র পড়িলে শেলির এপিসাইকিডিয়নের একটি লাইন মনে পড়ে—

Ah me!
I am not thine! I am a part of thee.

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে কামের রাজ্য ছাড়াইয়া প্রেমের স্বাধীনরাজ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তারপরিচয় এই গুটিকতক মাত্র পদাবলীতে পাই। যদি কোন তুলনা করিতে হয়, তবে চণ্ডীদাসের এই প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গে বরং রবার্ট বার্ণসের কিংবা হাইনের অনেক গানের একটা ভাগবত সাদৃশ্য পাওয়া যাইতে পারে। কারণ বার্ণসের মত চণ্ডীদাসের প্রেমের বিশেষত্বই হইতেছে, একটা সরল আবেগতন্ময়তা,

একটা বেদনাময় নিবিড়তা (Intensity) নিয়ে উদ্ধৃত পদটি তাহার সুন্দর উদাহরণ :—

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥

ইহা পড়িলে বার্নসের সেই পংক্তিগুলি মনে পড়ে না ?

When I sleep I dream
When I wauk I'm eerie,
sleep I can get nane
for thinkin on my dearie.

কিন্তু এরকম যথেষ্ট পদ চণ্ডীদাসে নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বড় জোর দশটি কি পনেরটি পদ পাওয়া যাইতে পারে। তার বেশী নয়। বাকি সমস্তই কামোদ্দীপক পদাবলী ; সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য কিছুই নয়।

রবিবাবু বহু পূর্বে তাঁর সমালোচনা গ্রন্থে বিদ্যাপতির রাধিকা ও চণ্ডীদাসের রাধিকার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া চণ্ডীদাসের রাধিকাকে রসেটিরই মত চণ্ডীদাসেরই Transfigured life বা রূপান্তরিত জীবন বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা যে চণ্ডীদাস নিজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—অবশ্য যেখানে যেখানে চণ্ডীদাস আপনি আপনার গভীরতর ব্যক্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সেই রাধিকার প্রেম আবেগে অধীর, অথচ সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বাতীত। প্রেমের সেই আবেগের বেদনায় তিনি বলিতেছেন 'দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া পাঁজর ধসিয়া গেল।' এবং 'ধসিতে ধসিতে সকলি

খসিল নির্মল হইল দেহ।' কারণ চণ্ডীদাসের এ প্রেম অন্যান্য বৈষ্ণব কবির মত কাম নয়, কামকে ধ্বংস করিয়া তবে ইহার প্রতিষ্ঠা।

তিনি বলিতেছেন—

মনের সহিতে করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

চণ্ডীদাসের এ প্রেম নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া গেলেও সকল সম্বন্ধকে ছাড়াইয়া আছে। কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা কোন খণ্ডকালে নয়, সে একেবারে অনাদিকালে। তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন, 'দিবস রজনী না ছিল যখন তখন গনেছি মাস।' এবং 'মা বাপ জনম না ছিল যখন আমার জনম হ'ল।' এবং 'কহে চণ্ডীদাসে কে আমি কে তুমি ইহা না বুঝয়ে কেহ।' অনাদিকাল হইতেই এই 'কে আমি কে তুমি' এই দুজনের রহস্যে দুজনে মজিয়া আছে। বাস্তবিক চণ্ডীদাসের এসব কবিতা অতি বিস্ময়কর। অতএব বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে একা চণ্ডীদাসের কতক কতক কবিতারই বিশ্বসাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং বিদ্যাপতির দু একটা পদেরও পারে দেখা গেল। তারপর জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, প্রভৃতি পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেরই ছায়া। তবু তাঁদেরও দুএকটা পদ খুবই চমৎকার এবং চিরকালের আদরের যোগ্য। যেমন জ্ঞানদাসের 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' পদটি। কিম্বা 'তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি' পদটি—যাহাতে সেই চমৎকার পংক্তিটি আছে—"হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।"

কিন্তু যিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভাবী বাংলা কবিতার ধারা আর রাধিকার নব নব রূপান্তর ঘটানোতে নিযুক্ত থাকিবে না। যিনি যত দিব্য চক্ষে দেখুন না কেন, বৈষ্ণব কবিতার পুনরাবৃত্তির কাজে

বা রূপান্তর সাধনে বাংলা কবিতা কোন কালেই লাগিবে না। কারণ বাংলা কাব্য সাহিত্যের মধ্যে এখন বিশ্বসাহিত্যের হাওয়া বহিয়াছে। বাংলা কবিতা এখন আর সেই বৃন্দাবন পুরাণটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। এখন তার বিষয়—মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা, বৃন্দাবন নয়। তার বর্ণনীয় রাসমণ্ডল—সমস্ত বিশ্বের সমস্ত বিশ্বমানবের "বিবর্তবিলাস"। তার যুগলপ্রেম শুধু মধুর রসে আবদ্ধ নয়, শুধু নীপকুঞ্জে তার অভিসার নয়,—জীবনের বিচিত্র ঋজু কুটিল পথে তার অভিসার, কত সংশয় দ্বন্দ্ব পাপের মধ্যে তার অভিসার, কত উত্থান পতন জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া তার অভিসার যাত্রা। এ প্রেমের মধুর রস জীবনের বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া তবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবে। এই বিচিত্রতাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিবে—এত বড় জীবনটাকে দূরে রাখিয়া তবে রসের খেলা হইবে? যাঁহার চোখ আছে তিনিই দেখিতে পান যে বৈষ্ণব কবিতার এক ধারাকেই পূর্ণতর করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর কাব্যগুলি রচিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতা যে জীবনবিমুখ, তাহা যে জীবনের কবিতা নয়, তাহা 'সোনারতরী'তেই কবি উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—

"এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?"

কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবের সখ্য মানে এ নয় যে জীবনের নানা সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম সখার সঙ্গে সখ্যরসের আদান প্রদান করা। বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইয়াছিল, সেই পুরাণ কথা শ্রবণ করিয়া যেটুকু সখ্যরস মনে উপজিত হয়—সেইটুকু পর্যন্ত তার দৌড়। বৈষ্ণবের বাৎসল্য মানে এ নয়' যে, আমাদের ঘরে ঘরে

যে বৎস রহিয়াছে তারি মধ্যে ভগবানের বাৎসল্যরস উপলব্ধি করা। বালগোপাল কৃষ্ণের বিগ্রহকে বৎসরূপে সেবা করার দ্বারা যেটুকু বাৎসল্যরস মনে জাগে, সেইটুকু পর্যন্ত তার দৌড়। তার বেশী নয়। আর মধুর রস মানেও এ নয়, যে, সকল বস্তুর যুগল সম্বন্ধের মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত নিত্যযুগল সম্বন্ধকে উপলব্ধি করা। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অবতার বলিয়া তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকাভাব ফুটাইয়াছিল মাত্র, আর কোন বৈষ্ণবের পক্ষে নিজেকে রাধিকা কল্পনা করা heresy। আর বাস্তব যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ঐ রসের কোন উপলব্ধির কথাই নাই; কারণ বৈষ্ণব সাধনায় বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান। 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' কবি সেই বৈষ্ণব রসধারাকে আমাদের মত দীন মর্ত্যবাসীদের জীবনে জীবনে এবং জীবনের প্রতি অভিজ্ঞতার মধ্যে অজস্র বহাইয়া দিয়াছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দীনেশচন্দ্র সেন॥ বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা। ১৯৩০

বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।...

বৈষ্ণব কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য, বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব; এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়া যায়। আসল পাওয়া জিনিস হারাইয়া যায়

এবং সমস্ত বিষয়টা—যাহা পরিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা—জটিল অস্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের স্পৃহা মিটে না। শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ণা মিটে না। এ কি অফুরন্ত রহস্য। এই অপার আনন্দের পার-পার দেখা যায় না।

রাধার তপস্যা যোগীর তপস্যা,—সারারাত্রি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন, প্রিয় যখন ডাকিবেন, তখন সে দুর্গম পথে যাইতে হইবে,—পথে কাঁটা বিছাইয়া দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সারারাত্রি পথ হাঁটেন, অমাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে তাঁহাকে বাঁশীর সুর শুনিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া যে ছুটিতে হইবে! এই সকল পদে পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের মিলন, বিয়োগান্ত নাট্যের সমস্ত কারুণ্য অথচ তাহা সিঁড়ির পর সিঁড়ির ন্যায় প্রেমের উপর উচ্চ স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

আমরা 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় পার্থিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য মানুষ যত কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে, পল্লী-কবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রাসাদ-স্বামী কুটীরবাসিনীর পায়ে সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছেন; কুটীরবাসিনী তাহার প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়া দিয়াছে। কত বিরহীর অশ্রু, মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্বেতাজস্কন্দর নির্মলতা, কত বীরোচিত ধৈর্য ও মূর্ত সহিষ্ণুতা—পল্লীগীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের অতীত সেই মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে। কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি—এক কথায়, যে কোন কালে যে-কোন

নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পরে প্রেমের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন —কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য চৈতন্যদেব তাহারই প্রমাণ। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়' নায়িকাদিগকে প্রেমের যে উত্তুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ণব কবির বৈকুণ্ঠ আরও দূরে,—মনে হয়,গীতিকার নায়িকাদের আর-এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ডী শুরু হইয়াছে। শত শত সতী যে চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্য-স্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয়, তখন তাহার নাম হয় 'রাধা-ভাব'।
